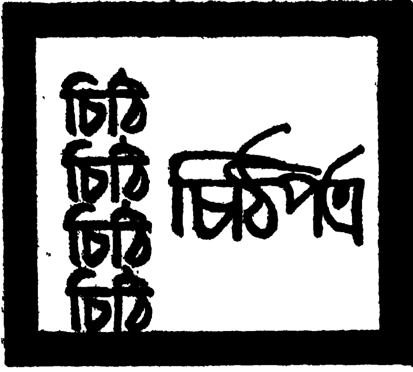
ধনধান্যে

বাজেট সংখ্যা
১৬-৩১ জুলাই ১৯৭৭



আমি আপনার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধনধান্যে'র নিয়মিত ছোট্ট পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত রচনা সম্ভারই বর্ত্তমান, তবে আমার সামান্য অনুরোধ যে আপনি অন্তত গল্পের সংখ্যা আর একখানি বাড়াবেন।

সোমনাথ নায়েক
বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বীরভূম

আপনার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই আমার হৃদয়ে গভীর আনন্দ এনে দিয়েছে। ১৬-৩১ মে, ১৯৭৭ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রী উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সাংবাদিকতা ও আধুনিক বাংলা গদ্য শিল্প অনন্য সাধারণ রচনা হয়েছে। ভালো লেগেছে শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর 'কৃষক কবি' প্রবন্ধটি। শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' একটি প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ডাইনোসর খুব ভাল গল্প। শ্রী নিতাই বসুর 'নরেন্দ্র নাথ মিত্রের' ওপর লেখাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। কবিতাগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী।

অশোক পোদ্দার
এম. আই. জি. কোয়ার্টার্স, কলকাতা-২

টাকা কিভাবে আসে যায়

চলতি বছরে ভারত সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রতি টাকার ২৩ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১৫ পয়সা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ১২ পয়সা আসবে পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাণিজ্য শুল্ক থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাজারের ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে, ১০ পয়সা আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে, ৮ পয়সা আসবে কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে, ৬ পয়সা আসবে বহিরাগত ঋণ থেকে এবং ২ পয়সা আসবে আয়কর থেকে এবং বাকি ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর আদায় থেকে।

এইভাবে সংগৃহীত অর্থের প্রতি টাকা সরকার নিম্নলিখিত হারে ও খাতে ব্যয় করবেন—৩৭ পয়সা পরিকল্পনায়, ২০ পয়সা অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় সংকুলনের জন্য, ১৮ পয়সা প্রতিরক্ষায়, ১০ পয়সা ধার দেওয়া টাকার সুদ পরিশোধে, ৯ পয়সা অন্যান্য খাতে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধ ও অন্যান্যভাবে দেওয়া হবে টাকায় ৬ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ধনধান্যে'র আগামী সংখ্যাটি বিশেষ যুগ্মসংখ্যা হিসাবে পনেরই আগষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধ।

সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ।

এছাড়া থাকছে, 'স্বাধীনতার ত্রিশ বছর'—এই পর্যায়ে একটি আলোচনা।

সেই সঙ্গে গল্প, কৃষি, খেলাধুলা, নাটক, সিনেমা, মহিলামহল ইত্যাদি নিয়মিত রচনা।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্‌ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন: ২৩-২৫৭৬

পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী



উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ জুলাই, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পা—অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদকের কলমে

গত সতেরই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রথম বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তৈরী প্রথম বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। কারণ নতুন সরকার বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে পেয়েছেন খুব কম সময় ও পূর্বতন সরকারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও এবছরের বাজেট আগামী দিনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশারী রূপে চিহ্নিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ যখন একান্তই কাম্য তখন বাজেটের ফলে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে বরং কমপক্ষে স্থিতিশীল থাকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে। তাই তিনি আয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য যাতে ন্যূনতম থাকে সেজন্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য অসামরিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩০ কোটী টাকা কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা পালনের জন্যও নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজেটের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কৃষিখাতে বাজেটে ত্রিশ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে জন্য যে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামাঞ্চলের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ, বাজার, পানীয়জল প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয় একে পুনর্গঠিত করতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ইংগিত বহন করছে এবছরের বাজেট। তাই অনুন্নত ও গ্রামীণ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ-দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এজন্য পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে শিল্পের অধিকারের ক্রমবিন্যাশ করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আছে পেনশনভোগীদের আরও সুযোগ সুবিধা দান, পানীয় জলের জন্য চল্লিশ কোটী টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব, আয়করের রেহাই সীমা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, দেশীয় কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় যন্ত্রাংশ নির্মাণের ছোট কারখানার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রভৃতি। তবে দশহাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের আয়করের রেহাই সীমা আগের আট হাজার টাকায় বহাল রাখা এবং আয়করের সারচার্জ বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিড়ির উপর কর ধার্যের ফলে ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর চাপ পড়বে। এসব দু একটা বিষয় গণ্য না করলে বাজেটে কর প্রস্তাব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা আশা করা যায়। আর এবছরের বাজেট যদি দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী স্বস্তির।

কেন্দ্রীয় বাজেট

পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

এবারের বাজেটের দুই লক্ষ্য

বিশেষ প্রতিনিধি—

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সম্প্রতি নতুন সরকারের যে প্রথম বাজেটটি পেশ করলেন তার উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং উন্নয়নের সুফলগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে রয়েছে মোট ১৫,৩৬৬ কোটি টাকা। চলতি কর হার অনুযায়ী কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হবে ৮,৮৭৯ কোটি টাকা, যা ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৭৯৮ কোটি টাকা বেশী। এই বেশী কর আদায়ের দরুণ রাজ্যগুলির ভাগে থাকবে ১০১ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক থেকে সংগ্রহ হবে ৪,৫৫০ কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৭৩ কোটি টাকা বেশী। আয়কর এবং করপোরেশন কর থেকে আদায় হবে ২২৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ—১৮০ কোটি টাকা বেশী। আমদানী শুল্ক থেকে আদায় হবে ১৭৩৪ কোটি টাকা।

বাজারের ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। গত বছরে ঐ হিসেব ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিদেশী মুদ্রার জমা তহবিল থেকে সরকার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন।

ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হবে ১০৫২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনাখাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছর বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭৫৯ কোটি টাকা।

এবারের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমছে। শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি হল সবরকম ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা। সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ঐ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বাজেটে ঐ ধরনের ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব রয়েছে।

যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত হিসেব এবং বর্তমান কর হার অনুযায়ী রাজস্বের হিসেব নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে ২০২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে।

যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা, যা অন্তবর্তী বাজেটের তুলনায় ৫৬ কোটি টাকা কম। খাদ্যের জন্য ভরতুকি এবং মজুত খাদ্যের পরিবহণ বাবদ হিসেব ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। ঐ হিসেব অবশ্য আলোচ্য বছরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন বছরের ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারী পেনসনভোগী অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছুটা সুবিধাবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধ রেখে এবারের বাজেটে তাদের কিছু সুবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ বাবদ খরচ হবে বছরে ১০ কোটি টাকা।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে অর্থনৈতিক ক্রটিগুলি দূর করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নীতি ঢেলে সাজানো দরকার। পুনর্গঠিত যোজনা কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানান, সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকের সংগে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং জনতা পারটির নির্বাচনী ইস্তাহারের সংগে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি নতুন পথ নির্দেশ করবেন বলে সরকার স্থির করেছেন।

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোজনার পরিবর্তন করে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, খাদি, এবং গ্রামীণ শিল্প, রেশম, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, গ্রামাঞ্চলে ডাক, টেলিফোন, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের মূল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, হাঁসমুরগীর খামার, মাছচাষ ও বনাঞ্চল তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধপালন কেন্দ্র পরিচালনার উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে। কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান যোজনা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির চাহিদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে, এবং তুলা, তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানের জন্য একটি মরু উন্নয়ন সংক্রান্ত পুরোধা প্রকল্প নেওয়া হবে। বর্তমান যোজনায় এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার দরুণ রাজ্য সরকারকে আগাম পরিকল্পনা সাহায্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অ্যাগ্রিকালচারাল রিফিন্যান্স অ্যাণ্ড ডেভলেপমেন্ট করপোরেশন এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে ২৬০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেচের পাম্পসেট বৈদ্যুতিকৃত করার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কৃষি, বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সার, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ৩০.৪ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করা হবে।

গ্রামের উন্নয়নে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে সংযোগকারী সড়ক তৈরীর ব্যাপারে আরও জোর দেবেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুরুতে এ বাবদ বিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা থেকে আরও টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে "কাজের বদলে শস্য" নামে নতুন প্রকল্পটির সাহায্য নেওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য দেবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে শ্রী প্যাটেল জানান। এ ব্যাপারে এ বছরই বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে আরও বেশী টাকা যোগানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ও ব্যয়বরাদ্দে তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও এ সব রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তবুও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে ২৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সিঙ্গরৌলি অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় একটি অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সুরু করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এ বাবদ খরচ করেন ১৬৭৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাহায্যার্থে গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশনকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
রাজস্ব	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
আদায়	৮২১৯	৮৫০৭	৯৪২৪
			(+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	৭৬৯০	৮৫৫৪	৯৪৮৭
	(+) ৫২৯	(−) ৪৭	(−) ৬৩
			(+) ১৩০ শতাংশ
মূলধন			
আদায়	৪৪২৩	৫২৫২	৫৯৪২
ব্যয়	৫২৮০	৫৬৩৩	.৬০৮১
	(−) ৮৫৭	(−) ৩৭৮	(−) ১৩৯
মোট			
আদায়	১২৬৪২	১৩৭৫৯	১৫৩৬৬
			(+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	১২৯৭০	১৪১৮৪	১৫৫৬৮
মোট ঘাটতি	৩২৮	৪২৫	২০২
			(−) ১৩০ শতাংশ

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করার পর বাজেট প্রসঙ্গে নানা আলোচনা এখনও চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারী ব্যয় কমানো-বাড়ানোর কোনো বিশেষ প্রবণতা এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর বসিয়ে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু বাজেটের এই সম্পদ সংগ্রহের দিকটি আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমরা আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি শুধু সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণের নীতির দিকে।

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৮ কোটি টাকা। এই সমগ্র পরিমাণকে আমরা নানাভাবে বিভক্ত করে হিসাব-নিকাশ করতে পারি। প্রথমত দেখা যাক এই ব্যয়ের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কতটা। মূলধনী খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার দ্বারাই প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক ভাবী বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যদিও শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলধনী-খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব সঙ্গত হবে না। বাজেটের হিসাবে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশের কিছু কম (৬,০৮১ কোটি টাকা) মূলধন-খাতে খরচ হবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই ধরণের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের সামান্য উপরে। সেই বৎসর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূলধন-খাতে ব্যয় ঐ পর্য্যায়ে পোঁছাতে পারেনি। সুতরাং পূর্ববর্তী বাজেটে এবং বর্তমান বাজেটে এই দিক দিয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ . বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ শতাংশের সামান্য কিছু কম। কিন্তু মূলধন-খাতে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে ৮ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

দেশে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষা, সমাজসেবা বা আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নকল্পে কতটা কাজে লাগানো হবে তার নীতি সব দেশে, সব যুগে এক থাকেনি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের গঠনমূলক কিংবা বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু? চলতি বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ৪,২৫০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ এই ধরণের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ ছিল ২৭ ভাগ কিংবা সামান্য কিছু কম। এখানেও দুটি বাজেটে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু চোখে পড়ছে না।

বিকাশমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সমবায় ভিত্তিক সংস্থা কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়ে থাকেন। যদি এই ধরণের ঋণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশ সহায়ক ব্যয়ের রকমফের বলে ধরা হয়, তবে মোট ব্যয়ের শতকরা আরও প্রায় ২২ ভাগকে এই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। পূর্ব্ববর্তী বৎসর এবং বর্তমান বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে এই দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সরকারের যে-সব ব্যয়কে কোন অর্থেই বিকাশমূলক বলা যায় না তার মধ্যে প্রধানতম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অনুপাত চলতি বাজেটে শতকরা ১৭.৭। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে সম্ভবত শতকরা ১৮ ভাগ। আনুপাতিক হারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু কমেছে। অনুরূপ ব্যয়-সংক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শাসনতন্ত্র পরিচালনার নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পরিষদীয় কাঠামো, মন্ত্রিসভা, রাজস্বসংগ্রহ বিভাগ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে সংযত রাখার প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। কিন্তু অন্য দিকে পুরাতন ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ এবং পেন্সনভোগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা একটু বেশী করেই বেড়েছে। সুতরাং এই ধরণের বাঁধা খরচের পরিমাণ কমিয়ে বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য আর্থিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ভাবে ৩,৬৩৮ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার হাতে পাবেন। এর মধ্যে ২,১৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্যের পরিকল্পনাভুক্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আরও ৫০৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পরিকল্পনার বাইরে নানা ধরণের গঠনাত্মক কাজের সহায়তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হবে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ১০.৪ ভাগ.

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট
আয়করে কিছু রেহাই
পরোক্ষ কর ১৩০ কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের (১৯৭৭-৭৮) কেন্দ্রীয় বাজেটে করপ্রস্তাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারগুলিকে আয়কর দিতে হবেনা। আয়করের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা আট হাজার টাকাই রাখা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার বেশী সেখানে এখনকার মতই আট হাজার টাকার বাড়তি টাকার উপর কর দিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী হলে সেখানে কিছু রেহাই দেওয়া হবে। কোম্পানী বাদে সর্বশ্রেণীর আয়কর-দাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হারও বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে আয়করের হারে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য অর্থমন্ত্রী গতবছর প্রচলিত বিনিয়োগ সাহায্য কর্মসূচীটিকে আরো সুবিস্তৃত করেছেন। এক্ষেত্রে সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, মদ ইত্যাদির মত নিম্ন অগ্রাধিকারযোগ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর সর্বশ্রেণীর শিল্পকে ঐ বিনিয়োগ সাহায্যের সুযোগ দেওয়া হবে।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানী-গুলির সঞ্চয় বাড়ানো, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য আরো বেশী অর্থবরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা। পরোক্ষ কর সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্পদ কর বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বর্তমানে মোট সম্পদের প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার উপর সম্পদ করের হার আধশতাংশ বজায় থাকলেও তার ওপরের স্ল্যাবে আরো আধশতাংশ সম্পদকর বাড়বে। বর্তমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নীট সম্পদের করধার্যযোগ্য স্ল্যাব দুইভাগে করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাব ২,৫০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী স্ল্যাব ২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা। এর-ফলে ৭৭-৭৮ সালে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে।

আয়কর দাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পটি আরো দু বছরের জন্য চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য সত্তর বছরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে না।

দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণালব্ধ কারিগরি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হলে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রী চালু মূলধনী আদায় করের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, সরকার রুগ্ন কলকারখানা অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নন। তবে রুগ্ন কারখানা যদি কোন চালু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে চায় তবে সরকার সেক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন।

কোন কোম্পানী যদি অনুমোদিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেন তাহলে সরকার তাকে করযোগ্য লাভ থেকে কিছু রেহাই দেবেন। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপিত হলে এবং সেগুলি এবছরের ৩০ জুনের পর উৎপাদন সুরু করলে এইসব শিল্পোদ্যোগ তাদের লাভের ২০ শতাংশ করযোগ্য আয় থেকে ছাড় পাবেন।

কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে আয়করের ওপর ৫ শতাংশ সারচার্জের বদলে শিল্পো-ন্নয়ন ব্যাঙ্কে পাঁচ বছর ঐ হারে টাকা জমা রাখার সুবিধা এ বাজেটে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা দু লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়করের হারের কোন হেরফের হবেনা। তবে কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য সব করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হলো। প্রত্যক্ষকর থেকে বর্তমান বছরে ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে।

শ্রী প্যাটেল জানান প্রত্যক্ষ কর আইন দিন দিন জটিল হয়েছে। তাই এর সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ।

এবারের বাজেটে মোটর যানবাহনের ওপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ওপর শুল্ক ২.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ী ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ শতাংশ হয়েছে। দুই ও

তিন চাকার গাড়ীর টায়ার, টিউব ও ব্যাটারীর ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়ায় এসব গাড়ীর ওপর প্রকৃতপক্ষে নীট ২.২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ছে। এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে এবাবদ মোট ৫.১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমানে রং তৈরীর দ্রব্যাদি, রং, এনামেল, বার্নিশ প্রভৃতির উপর উৎপাদন শুল্ক নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে মূল্যানুপাতে ধার্য্য করার প্রস্তাব রয়েছে। বেশী দামের দ্রব্যাদির ওপর সাধারণত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কমদামের দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রায় একই রকম থাকবে।

সিনেমার ফিল্মের ওপরও মূল্যমান বিচার করে সংশোধিত শুল্কের হার মূল্যানুপাতে ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব আছে।

সিগারেটের দামের ওপর মূল্যানুপাতিক হারে কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিড়ির ওপর কর প্রতি হাজারে ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা করা হয়েছে। এই সব কর থেকে বছরে বাড়তি আয় হ'বে ৪৫ কোটি টাকা।

(১) ইতিপূর্বে শুল্ক ধার্য হয়নি এমনসব হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (২) ওজন করার যন্ত্র, (৩) হাত ঘড়ি ও টেবিল ঘড়ি, (৪) বৈদ্যুতিক বাতির সরঞ্জাম, (৫) জুতোর কালি, গাড়ির রং ধাতুর পালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কালি শিল্পগুলিকে শুল্কের রেহাই দেওয়া হ'বে। আশা করা হচ্ছে এবাবদ মোট ১১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমান বাজেটে নির্দ্দিষ্টভাবে নতুন উৎপাদন শুল্কের আওতায় পড়েনি এমন সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক বর্তমানে ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশ করা হবে। শুল্ক ধার্য্য হয়েছে এরূপ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে এইসব পণ্যের ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে। এই শ্রেণীর আওতায় ছোট ছোট অনেক শিল্প সংস্থা রয়েছে বলে স্থির হয়েছে, কর্মী সংখ্যা অনুপাতের বদলে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পগুলিকে উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ-বিহীন সকল শিল্পকেও এই ছাড় দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর পরোক্ষ করের প্রস্তাবে হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পগুলি লাভবান হবে। ২০ কাউণ্ট সুতো পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাড়তি কাউণ্টের জন্য প্রতি কেজিতে ৩০ পয়সা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে স্পান সুতো ব্যবহার করায় এক্ষেত্রেও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশিল্পকে বর্তমানের চক্রবৃদ্ধি হারের উৎপাদনশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৮০ হাজার তাঁত শিল্প শুল্ক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাবে। সিক্রেম্পিং সুতোর ওপর শুল্কের হার প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে ৫ পয়সায় কমানো হয়েছে।

ট্রানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ষ্টিরিও প্রভৃতি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ওপর মূল্যানুপাতে শুল্কের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে মূল্যানুপাতিক শুল্কের হারে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। ৩৬ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীনসহ যে সকল টি. ভি. সেটের উৎপাদন মূল্য ১৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বা তার কম হবে সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। ৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত টেপরেকর্ডার এবং ১৭৫ টাকা পর্যন্ত হিসাব রক্ষন যন্ত্র এ সুযোগ পাবে।

সমবায় সমিতি বা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সদস্য ক্ষুদ্র এবং কুটীর দেশলাই শিল্পগুলি উৎপাদনের ওপর বর্তমানে প্রতি গ্রসে ৫৫ পয়সার বদলে দ্বিগুণ ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক ইনসুলেটিং টেপ, প্লটেড এঞ্জেলস, মিষ্টি, টফি, টিনের খাদ্যও শুল্কের রেহাই পাবে।

মিনি-ইস্পাত কারখানাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা থেকে কাঁচামাল হিসাবে স্ক্র্যাপ যোগান দেওয়া দরকার। সেজন্য এই সব কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল হিসেবে বড় ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে যেসব স্ক্র্যাপ আনা হবে সেগুলোর ওপর শুল্ক ছাড় দেয়া হবে।

শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পশম সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্তে কাঁচা ও নিকৃষ্ট পশম এবং কম্বলের ওপর আমদানী শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হ'য়েছে। মিহি পশমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫ পয়সা শুল্ক করা হবে। এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হবে তা আমাদানী করা কাঁচা পশমের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে পূরণ করা হবে। এর ফলে দেশজ পশমের দাম কমবে। ঘড়ির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ এর মারফত ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে। আমদানী-কৃত ঘড়ি জনসাধারণের কাছে কমদামে বিক্রির জন্য অর্থমন্ত্রী ঘড়ির যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির ওপর মূল্যানুপাতে আমদানী শুল্ক ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন।

নিউজপ্রিণ্টের ওপরও মূল্যানুপাতিক আমদানী শুল্কের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শিল্পপ্রসার ও দেশজ শিল্পের প্রতি-যোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মূলধনী পণ্য দেশজ উৎপাদনের অবস্থা আগে খতিয়ে না দেখেই আমদানী করার প্রস্তাবও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় মূলধনী পণ্য যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় আরো ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তামার তারের আমদানী শুল্ক বর্তমানে ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মূল্যানুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া ষ্টেনলেস ষ্টিলের ও হাই-কার্বন ষ্টিলের চাদর অন্যকোন মূলধনী পণ্য উৎ-পাদনে ব্যবহৃত হ'লে সেইসব ইস্পাতের চাদ-রের ওপর কর ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে গেইজ অনুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ২২ গেইজের ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসনপত্রের করও ৩২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২০ শতাংশ করা হ'য়েছে। তামা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির ওপর কর কমানোর ফলে আমদানী শুল্কে ৩৬.২৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবের ফলে ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ কোটি টাকার বদলে ৭২ কোটি টাকা হবে এবং চলতি বছরে পরোক্ষ কর থেকে মোট ১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আয় হবে।

মঞ্জুলা বসু

নতুন বাজেটে করপ্রস্তাব

এ বছর বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল যে উদ্দেশ্যগুলির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেগুলি হল উৎপাদনশীল কর্মসূচীকে উৎসাহিত করা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কতদূর সহায়ক হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থাকে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে তার পরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে এটা সাধারণ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল। নূতন সরকারের নানা সময়ে ঘোষিত নীতির থেকেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে বর্তমান বছরের বাজেটে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি, একমাত্র ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া। করসংক্রান্ত প্রস্তাবেও তাঁরা নূতন কর কিছু বসাননি বা পুরোনো কোনও কর তুলে নেননি, প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কিছু হের ফের ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য বাজেটে প্রত্যক্ষ করের থেকেই বাড়তি রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হবে বলে আশা করা হয়েছে। করবাবদ নূতন রাজস্বের প্রত্যাশিত পরিমাণ হল ২৪২ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের (Surcharge) হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ফলে সর্বোচ্চ স্তরে আয়ের উপর করের হার দাঁড়াচ্ছে ৬৯ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শুল্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত বা যৌথ পরিবারের আয়ের উপর প্রযোজ্য, কোম্পানীগুলির আয়ের উপর নয়। উপরন্তু কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য বিনিয়োগ ছাড় (Investment Allowance) দেবার যে ব্যবস্থা বিগত বাজেটে সীমিতভাবে ছিল আলোচ্য বাজেটে তা আরও বিস্তৃত করে দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র সিগারেট, মদ্যজাতীয় পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

ঊর্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের লোকেদের কিছু ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নতম আয়ের উপর করের হার কমানো হয়নি বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন যে আয়ের উপর কর কমানো হবে তার পরিমাণ বছরে ৮০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের কোনও আয়কর দিতেই হবে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় ১০.০০০ টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮০০০ টাকার ওপরই ছাড় দেওয়া হবে।

কর প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে বহু-বিতর্কিত বাধ্যতামূলক জমা-ব্যবস্থা (Compulsory Deposit Scheme) যা পূর্বতন সরকার চালু করেছিলেন তা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না, যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় যখন আসীন হল তখন এইরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে বাধ্যতামূলক জমা রাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে ও সঞ্চিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল এই যে একবারে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেদের বাদ দিলে সাধারণ লোকের করের ভার বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির ফলে অনেকখানিই বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যার বার্ষিক আয় তার দেয় করের পরিমাণ হবে শূন্য আর ১০,৫৫০ টাকা যার বার্ষিক করযোগ্য উপার্জন তার দেয় করের পরিমাণ হবে ৩৮৫ টাকা। পরবর্তী আয়ের ধাপগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ হিসাব করে দেখানো যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ওপর চাপ আলোচ্য বাজেটে বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যআয় সম্পন্ন লোকেরা বাজেটের ফলে যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য আবশ্যিক জমার ব্যবস্থাও দায়ী। ধনবৈষম্য কমানো ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অতিরিক্ত শুল্ক ও আবশ্যিক জমা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই প্রস্তাবগুলির জন্য অসুবিধা আছে। এই দুটি ব্যবস্থাকেই বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করা উচিত, সেই সাময়িকতার জন্যই এদের প্রভাব। স্বাভাবিক সময়ে দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর মধ্যে এগুলিকে গ্রহণ করলে ক্রমশ এদের ধার

কমে আসে এবং স্বল্পসময়ের জন্য ফলপ্রসূ হলেও অন্তত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘকালে প্রভাব কমে যায়।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক কর সঞ্চয়ের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রান্তিক আয়করের হার ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। মধ্য আয়ভোগী ও উচ্চবিত্ত লোকেদের সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগ ছাড়, অতিরিক্ত শুল্ক থেকে রেহাই ইত্যাদি যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাও কতদূর কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের হার যদি খুব বেশী হয় তাহলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে আয় বাড়াবার উৎসাহও নষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত আয়কর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের হারও বাড়ানো হয়েছে। ২.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার আরও ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দেয় করের হার বাড়ছে ১শতাংশ। সম্পত্তির উপর করের হার বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, প্রথমত বিগত বাজেটে এই হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সঞ্চয় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার পক্ষে ব্যক্তিগত আয়কর অত্যধিক না বাড়িয়ে অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর বসানোই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবের মধ্যে Capital Gains বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি-জনিত লাভের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন পাবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাসযোগ্য বাড়ী বিক্রী করলে তার মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর যে কর দেয় তা মকুব করা হয় যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ী তৈরী বা বিক্রী করা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। নতুন প্রস্তাবে অলঙ্কার বা শেয়ার বিক্রয়লব্ধ লাভের ক্ষেত্রেই অনুরূপ রেহাই দেওয়া হবে যদি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শেয়ার, ব্যাঙ্ক আমানত, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট ও অন্যান্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে খাটানো হয়। এই ব্যবস্থায় যাতে কেউ অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ অন্তত তিন বছরের জন্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখতে হবে। এর ফলে সম্পত্তিতে ফাটকাবাজী করে লাভের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট প্রস্তাবের ফল শেয়ার বাজারে অনুকূল হবে বলেই আশা করা যায়। বাজেট পেশ করার অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব এলেও পরে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে দেখা গেছে।

উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোম্পানীগুলিকে যে বিনিয়োগ ছাড় দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি অধুনালুপ্ত সম্প্রসারণের জন্য রিবেট (Development Rebate) এরই বিকল্প সংস্করণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্র-সারণে এই ব্যবস্থা উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে যাদের গুরুত্ব নেহাৎই কম সেই সব শিল্প ছাড়া অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব শিল্প দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে স্বয়ং-নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়ের অনুপাত ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য আলোচ্য বাজেটে আরও কিছু প্রস্তাব আছে যা সকলের সমর্থন পাবে। যেমন গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপন করলে তারজন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে কর বসানোর প্রস্তাব আছে। বর্তমান বছরের জুন মাসের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প সংস্থাপন করলে দশ বছর তাদের লাভের ২০ শতাংশ আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তেমনই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ২৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তারা যাতে অযথা বিব্রত না হয় সেজন্য উৎস থেকে আয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও প্রচলিত করব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করে প্রচলিত করের হারেই কিছু অদলবদল করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করার বিষয় হল যে কতকগুলি জিনিষের উপর ১ শতাংশ হারে নতুন আবগারী কর বসছে, যার মধ্যে আছে, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ওজনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাত ঘড়ি ও টাইমপীস, জুতোর কালি, গাড়ির পালিশ। ১২ শতাংশ হারে আবগারী কর বসছে ক্ষুদ্রশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের উপর (যদিও ১ লক্ষ টাকা উৎপাদন পর্যন্ত একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

রেডিও, ট্র্যানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও ইত্যাদির উপর মূল্য অনুসারে ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫শতাংশ পর্যন্ত আবগারী কর ধার্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পমূল্যের টি. ভি. সেটের উপর আবগারী কর হবে ৫ শতাংশ। যথারীতি সিগারেট, বিড়ির উপর ধার্য করের বৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যথারীতি বলছি এইজন্য যে সব বাজেটেই বিড়ি সিগারেটের দাম বাড়াটা যেন একটা অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ির উপর করও বাড়ছে। আমদানী শুল্ক বাড়ছে বিদেশী পশম, কম্বল ইত্যাদি পশমজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুল্ক কমছে তাঁতবস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প, সমবায় সমিতির প্রস্তুত দেশলাই, জলতোলার বৈদ্যুতিক পাম্প,

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রুমমেট / দেবযানী



আমার মত আড্ডাবাজ মেয়ের সঙ্গে যে শকুন্তলা আপ্তের কি করে ভাব হ'ল সেটা শুধু আমার বন্ধুমহলেই একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আকৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না আমাদের। শকুন্তলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু মনে হ'ত তার রূপ যেন শুধু দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বড় বেশী শান্ত ও গম্ভীর মেয়েটির সমস্ত হাবভাবের মধ্যে একটা সুসংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠতো সব সময়। সবার থেকে সে যে স্বতন্ত্র একথা যে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দেখতো সেও বুঝতে পারতো। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। শকুন্তলাকে কেউ কখনও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শকুন্তলা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হ'তে না পারার দুঃখ ভুলেছিল আই. এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বিট্ করে। কিন্তু সবসময় নিজের চারিদিকে কি যেন এক গণ্ডী টেনে রাখতো শকুন্তলা। নিজের স্বপ্নের রাজ্যেই বিভোর হয়ে থাকতো সে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাকে রীতিমতো সমীহ করতো। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেছিল অনেকেই কিন্তু তার সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি কেউ।

সব দিক দিয়েই শকুন্তলার বিপরীত ছিলাম আমি। নিজমুখে রূপের প্রশংসা করাটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু অতিরিক্ত বিনয় না করেও বলতে পারি যে ঠিক প্রশংসা করার মত রূপ আমার ছিলনা কোনকালেই। আর গুণ? ফাঁকিবাজ, ক্লাস-পালানো ইত্যাদি নানারকম দুর্নাম অর্জন করেছি কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যে রেটে বেড়ে চলেছিল তাতে হিতাকাংখীরা রীতিমত আতঙ্কিত হতেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। Academic career ও তথৈবচ। ভাল রেজাল্টের প্রতি একেবারে লোভ নেই একথা বলতে পারিনা, কিন্তু তার জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে অন্যান্য বিষয়ে তা করতে আমি নারাজ।

এ হেন গোল্লায় যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা রত্নটির এমন গলায় গলায় ভাব হওয়া যে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের অন্যতম একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল অতি সাধারণভাবে। বি. এ. তে আমাদের দু'জনেরই সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতের "স্যার" একটু বেশীরকম কড়া মেজাজের লোক। টিউটোরিয়াল ক্লাসে 'টাস্ক' করে না আনলে এমন বাছা বাছা বাক্যবাণ ঝাড়তেন যা আমার মত নাককান কাটা মেয়েরও অসহ্য লাগতো। মেয়ে বলে ছেড়ে দিতেন না তিনি। প্রথমে কিছুদিন অসহযোগ চালালাম—তাঁর টিউটোরিয়ালের ধারে কাছে, ঘেঁসতাম না। শেষে বুঝলাম এভাবে চলবে না। টিউটোরিয়ালের পার্সেন্টেজ কমে গেলে নিজেরই বিপদ, পরীক্ষা দিতে পারবো না। বেগতিক দেখে অবশেষে শকুন্তলার শরণ নিলাম—তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে দেখতে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে কলেজে সবার মুখে মুখে ওই এক কথা ফিরতে লাগলো। সবাই হিংসে করতো বুঝতাম এবং সেজন্য রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম।

ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই বাবা বদলী হয়ে গেলেন পাটনা থেকে সেই সুদূর পাঞ্জাব। আমায় হষ্টেলে থাকতে হ'বে এবার—জীবনে প্রথমবার। শকুন্তলা হষ্টেলেই থাকতো বরাবর। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে ধরে আমরা দুজনেই একটি ডবল সিটেড রুম নিলাম। হষ্টেলে আসার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম

শকুন্তলাকে। বন্ধুহীন, চাপা মেয়েটির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম যেন। হষ্টেলে আসার পর থেকে আমার এমন আদর যত্ন শুরু করলো যে বাড়ি ছেড়ে থাকার দুঃখ দু'দিনেই ভুলে গেলাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ওর গিন্নীপনায়। কোনদিন রাত্রে হয়তো চুপি চুপি সিনেমা দেখে ফিরেছি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি শ্রীমতীর মুখ অন্ধকার। তারপরই শুরু হ'ত লম্বা বক্তৃতা। লেখা-পড়া না করলে কি ভবিষ্যৎ হ'বে, আজে বাজে সিনেমা দেখার পরিণাম কি, হোটেলে আমার মত ভাল মেয়েদের দেখলে লোকে কি ভাববে—ইত্যাদি নানারকম ফিরিস্তি। চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুনেই যেতাম। যখন অসহ্য মনে হ'ত হঠাৎ উঠে নিজের বাক্স প্যাঁটরা ধরে টানাটানি শুরু করতাম। জিজ্ঞেস করতো—"ওকি হ'চ্ছে?" গম্ভীর মুখে বলতাম—"রুম বদলাবো। থাকবো না এঘরে।" ব্যস, এক ওষুধেই সব ঠাণ্ডা। শকুন্তলার মুখে আর রা'টি শোনা যেত না খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক পরেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হ'ত—"খেয়ে নে। পাঞ্জাবী হোটেলের অখাদ্য কুখাদ্যে পেট ভর্তি। সে কথা বললে আবার ঘণ্টাখানেক ধরে যে উপদেশামৃত বর্ষিত হ'বে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হই। অতিকষ্টে দুধটুকু শেষ করে বিরক্ত হয়ে বলি, "সব সময় এমন জ্বালাস কেন বল্‌তো? তুই যে আর জন্মে আমার কে ছিলি ভগবানই জানেন—।" ও হাসে—"শুধু ভগবান কেন আমিও জানি।"—"কি?" "সতীন"—ও কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলে।

"উহুঁ, সতীন নয়, শাশুড়ি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

একদিন এক বাদলঝরা সাঁঝে একটি দুর্বল মুহূর্তে অবশেষে বলে ফেলি বহু-দিনের গোপন রাখা কথাটি। উৎসাহে আরও কাছে সরে আসে শকুন্তলা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিভ্রান্ত করে তোলে তার প্রশ্নজালে—"তাঁর নাম কি? কোথায় থাকে? কবে আলাপ হ'ল? বল শীগগীর—।" বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হ'চ্ছে। জানালার ধারে বসে সেই বর্ষণ ধারার দিকে চেয়ে বলে যাই আমার সেই কাউকে না বলা কাহিনী.....

বাবার যখন এলাহাবাদে বদলী হল তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। আমি অঙ্কে বরাবরই ভীষণ কাঁচা, তবু জেদ করে অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স নিয়েছিলাম। প্রথমে অতটা বুঝিনি, এখন যতই পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল ততই নিজের দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। শেষে একদিন কাতরভাবে বাবার দরবারে হাজির হ'লাম। কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লাম "অঙ্কের একজন মাষ্টার চাই বাবা, নইলে কিছুতেই পাশ করবো না।" বাবা তাঁর বন্ধু অবনী দত্তকে ধরলেন একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবার জন্যে। অবনীবাবুর ছেলে শোভন সবে বি. এস্. সি. পাস করে দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে। কি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। অবনীবাবু তাকেই আমার অঙ্ক শেখানোর ভার দিলেন।

শোভনের কাছে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল তা নাহ'লে ম্যাট্রিকটা অমন নির্ঝঞ্ঝাটে উৎরোতে পারতাম না। কিন্তু শোভনকে কাছে পেয়ে সমস্ত জীবন যেন তোলপাড় হয়ে গেল—দু'জনেরই। কি যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ দু'টি হৃদয়কে এক করে দিল। শোভনকে ভাল লাগা এমন কিছু বিস্ময়কর হয়তো নয়। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সব দিক দিয়ে যে কোনও মেয়ের কাম্য সে। তবু মনে হ'ত ওর প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা রূপ, গুণ বা সম্পদের নয়। সে যে কি তা বুঝতে পারতাম না।

আমি কলেজে ভর্তি হ'লাম। শুধু শোভনকে কাছে পাওয়ার লোভেই আবার অঙ্ক নিলাম। শোভন ছুটিতে বাড়ি এলেই আমায় অঙ্ক শেখাতো আসতো। অধ্যাপনায় তার মনোযোগ দেখে বাবা-মায়েদেরও তাক লেগে যেত মাঝে মাঝে।

দুরূহ ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর আড়ালে আমরা দু'জন তখন কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে চলেছি। দু'জনেই বুঝতাম সে স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে বাধা কোথায়। একদিকে জাত ও আরেক দিকে অর্থ ও রূপের পাঁচিল। অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না আমার রক্ষণশীল বাবা মা। শোভনের অভিভাবকরাও কক্ষনো রাজী হ'বেন না এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে এনে নিজেদের আভিজাত্য খর্ব্ব করতে। অবশ্য আইনের সাহায্যে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু মন মানতে চায়না সে কথা। সবাইকে দুঃখ দিয়ে সে মিলন সুখের হ'বে কিনা কে জানে।

আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ও বাবার পাটনায় বদলী হ'বার খবর প্রায় এক সঙ্গে এলো। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ম্লান করে দিল সাফল্যের সব আনন্দকে। বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি যাবার ছলে শোভনের সঙ্গে দেখা করলাম কালীমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতি দিলাম দু'জনে দু'জনকে—যদি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জীবন শেষ হয়ে যায় যাক্, তব এই ক'টি বছরই অক্ষয় হয়ে রইবে আমাদের জীবনে। অন্য কেউ আসবে না সেখানে।......

শকুন্তলা একমনে শুনে যাচ্ছিল আমার ইতিবৃত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো—"তার ফটো নেই তোর কাছে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। "কই দেখি?" খানিক ইতস্তত: করে ট্রাঙ্ক খুলে বার করলাম শোভনের সেই ফটোখানা যা অনেক যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন। ও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, তারপর হেসে বললো—"বাব্বা:, তোর বয়ফ্রেণ্ডের সংখ্যা দেখে মাঝে মাঝে এমন ভয় হ'ত ভাবতাম—,

তুই বাঝি কোনদিন কারো প্রতি সিনসিয়ার হ'তে পারবি না।" শোভনের ফটো আর ট্রাঙ্কে উঠলো না। বইয়ের আলমারীর মধ্যেই রেখেদিলাম সেটা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ খুলতো না সে আলমারী। আর ওতো জেনেই গেছে এখন।

শকুন্তলা এর পর থেকে প্রায়ই শোভনের বিষয় নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। একটু দেরী করে ফিরলেই সে কি রাগ—"বেচারী শোভনবাবু, কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের।" লেখাপড়া করিনা, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা নিয়ে সব সময় ভয় দেখাতো—"লিখছি শোভনবাবুকে, নিয়ে যান তাঁর মালুকে। আর আমি পারবো না' ইত্যাদি। আর যেদিন শোভনের চিঠি আসতো সেদিন তো কথাই নেই। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর চিঠি আসতো আর প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনাতে হ'ত শকুন্তলাকে। কারণ বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানতো না ও। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হ'ত ওর সঙ্গে। শেষে কোন কুল কিনারা না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আলো জ্বেলে দেখতাম শকুন্তলা তখনো চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতাম "কি ভাবছিস্ অতো?" ও ম্লান হেসে বলতো—"কিছুনা ঘুমো। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দি।" ঠাট্টা করতাম—"উঃ কুন্তীর কত ভাবনা, যেন কন্যাদায় পড়েছে।" ও হঠাৎ রেগে উঠতো—"কন্যাদায় থেকে রুমমেট্ দায়টা কিছু কম নয় মশায়, অবস্থায় পড়লে বুঝতে।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। শকুন্তলার আবার পুজো করার বাতিক ছিল। রোজ ভোরবেলা স্নান করে ঘন্টা খানেক পুজো না করলে ওর হ'ত না। তার উপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে তো কথাই নেই—নির্জ্জলা উপোস সেদিন। ওর ভক্তির বহর দেখে আমরা সবাই হাসতাম।

এরপর হঠাৎ এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ করলো শকুন্তলা। কি একটা কারণে ক'দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। হস্টেলে ফিরে আমাকে দেখেই দূর থেকে চ্যাঁচাতে লাগলো—"মালুর সব ঠিক হয়ে গেছে—"। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে যা বলে গেল তার সারমর্ম হ'ল—আমি নাকি শোভনকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি—। তার অতি সহজ উপায় আছে না কি আমার হাতের মুঠোয়। "উপায়টা কি শুনি?"—"সন্তোষী মা'র পুজো কর।" আমি ঠাট্টা ভেবে হাসতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ও ঠাট্টা করেনি। সত্যিই নাকি ওর পিসতুতো বোনের এক ননদ না কে যেন সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের বাঞ্ছিত দয়িত লাভ করেছে—এইবার বাড়ি গিয়ে সদ্য সদ্য শুনে এসেছে সে। শুধু শোনা নয় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে সেই সঙ্গে। সন্তোষী মা'র ফটো কিনে এনেছে একখানা, পুজোর মন্ত্রতন্ত্রগুলোও নোট করে এনেছে কোত্থেকে। "তোকে কিছু ভাবতে হবে'না মালু, শুধু রোজ ভোরে উঠে চান করে মাত্তর এক ঘণ্টা......।" শুনতে শুনতে কম্প দিয়ে জ্বর আসার উপক্রম হ'ল। আমি মালবিকা মুখার্জ্জী—কোনদিন সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছি এমন অপবাদ যাকে অতি বড় শত্রুরেও দিতে পারবে না, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক প্লেট জলখাবার না ধরলে যার হাঁক ডাকে বাড়ি এবং পাড়া (উপস্থিত হস্টেল) শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করে—খোদ সেই আমি ভোরে উঠে, স্নান করে, খালি পেটে করবো এক ঘণ্টা পুজো!!! তাছাড়া ভগবানে একটু আধটু বিশ্বাস যদিও ছিল তবু সন্তোষী মায়ের একটু স্তব স্তুতি করলেই যে আমাদের অমন গোঁড়া বাবা মা সব সংস্কার আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দেবেন এ কথা গাঁজাখুরি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না আমার। "ও সব আমার দ্বারা হ'বে না ভাই" নিতান্ত ভয়ে ভয়ে নিজের মতামত জানালাম তাকে। কিন্তু আমার মতামত নিয়ে মাথা ঘামাতে কুন্তীকে কোনদিনই দেখিনি, সেদিনও বিশেষ গা করলো না। নির্ব্বিকার মুখে পুজোর সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো সে। শেষে সেই অসম্ভবই সম্ভব করালো আমাকে দিয়ে। শীতকালের সকালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, চা জলখাবারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ঝাড়া একঘণ্টা দরজা জানালা এঁটে সে কি প্রাণান্তকর সাধনা। সংস্কৃত উচ্চারণটা কিছুতেই রপ্ত হ'ত না, পাশে বসে কারেক্ট করতো শকুন্তলা। অবশ্য বেশীদিন ভুগতে হয়নি আমাকে। সকালে স্নান টান কোনকালেই সহ্য হ'ত না। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর বাধিয়ে ফেললাম। শকুন্তলার বোধহয় করুণা হ'ল এবার, কারণ অসুখ সারার পর আর কোনদিন পুজো টুজো করতে বলেনি আমায়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। শকুন্তলা ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে পাশ করলো। আমি পাশ করলাম অতি সাধারণভাবে। অনার্স আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বেগতিক বুঝে। তারপর এম. এ.। এইবার একটু মুস্কিল বাধলো। শকুন্তলা ইকনমিক্স নিলো, আমি বাংলা। সারাদিন আলাদা আলাদা কাটতো, কিন্তু হস্টেলে এবারও আমরা দুজন রুমমেট। কাজেই আর সবই আগের মত চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে শোভন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। হৃদরোগ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাচ্ছে সে। যাবার আগে দিন পনেরোর জন্যে পাটনায় এলো বিদায় নিতে।

শকুন্তলার সঙ্গে শোভনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার নামে শোভনের কাছে নালিশ করবে বলে সবসময় শাসাতো, কিন্তু দেখলাম যত বক্তৃতা ওর আমার কাছেই। শোভনের সামনে একেবারে চুপ। মাথা হেঁট করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একটা কথা বলতে হ'লে ঘেমে নেয়ে উঠতো যেন, গাল দু'টো লাল হয়ে উঠতো অকারণে। খুব মজা

লাগতো আমার, কেমন জব্দ। রোজ শোভন এলেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম ওকে। শোভন কিন্তু বিরক্ত হ'ত। আড়ালে বকতো আমাকে— "রোজ ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আস বলো তো? আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর কতদূরে চলে যাবো, জানিনা আবার কবে দেখা হ'বে। অন্ততঃ এই ক'টা দিন তোমায় একা পেতে চাই—।"

রোজ শোভন আসার ঘন্টাখানেক আগে থেকে আমায় নিয়ে পড়তো শকুন্তলা। আমি নাকি চুল বাঁধতে জানিনা, শাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে পরতে শিখিনি এতদিনে। নিজে হাতে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, নিজের সব চেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরিয়ে দিত আর সমানে গজ্ গজ্ করতো। তারপর সব সাজগোজ শেষ হ'লে খোঁপায় ফাইনাল টাচ্ দিতে দিতে দুষ্টুমীভরা হাসি হাসতো। ফিরে এলে শোভন কি কি কথা বলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো বারে বারে।

অবশেষে পনেরোটি দিনের হাসি গান শেষ করে দিয়ে শোভন বিদায় নিল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার পুরোনো জীবনে। আগে শকুন্তলার জন্যে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো দু'জনের ক্লাশ আলাদা, কাজেই অবাধ গতি। রোজ ক্লাশ পালিয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ম্যাটিনি সিনেমা দেখতাম, কখনো কফি হাউসে আড্ডা বসতো। শকুন্তলা কিছুই টের পেত না। শোভনের কথা যে কখনো মনে পড়তো না তা নয়; কিন্তু, তার কথা ভাবলেই প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠতো মন। শোভন বলেছিল তার বাবা মা'র মতের বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না কোনদিন। রাগ করে বললাম, "তোমার কাছে বাবা মা'ই সব? আমি কিছু নই?" —"কে বলে তুমি কিছু নও? তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো। কিন্তু মা বাবার মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি।" মনে পড়তো তাকে দেওয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা। কি তার পরিণাম? জীবনে আর কখনো গড়তে পারবো না একখানি সুখের নীড়। জানি শোভনও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু সে পুরুষ। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিলিয়ে দেবে সে নিজেকে। কোনও রিক্ততাই থাকবে না তার। কিন্তু আমি! কি নিয়ে কাটবে এই নিঃসঙ্গ জীবন?

শোভনের চিঠির সংখ্যাও কমতে থাকে ক্রমশ। অসংখ্য হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষায় ব্যস্ত সে। হাজার হাজার মাইল দূরে তার কথা ভেবে কার হৃদয় বিকল হ'চ্ছে সে কথা মনে করার সময় কোথায়!..

একটু একটু করে রাত গভীর হয়। চোখের জলে ভিজে ওঠে বালিশটা। "মালু!" হঠাৎ দেখি কোন ফাঁকে শকুন্তলা মাথার কাছে এসে বসেছে। আমি উত্তর দিইনা। ও আস্তে আস্তে আমার চোখের জল মুছে দেয়।

এক একটা করে মাস কেটে যায়। একদিন খবর পেলাম ১৮ই মে থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হ'বে, অর্থাৎ ঠিক তিন মাস বাকী। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এম. এ. পরীক্ষা সাধারণত ঐ সময়েই হয়ে থকে এবং এবছরও যে হ'বে সেটা আগেই আমার জানা উচিৎ ছিল। তবু কেন জানি পরীক্ষার কথাটা কোনদিন মনে পড়েনি এর আগে, তাই হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম "মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে"। একটি বইও নেই আমার কাছে। থাকবেই বা কোথা থেকে। বই কেনার টাকাতেই তো সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়া চলতো। লাইব্রেরীর বই থেকেও কিছু নোট করিনি আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভবও নয়। সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতই অবস্থা।

অবশেষে সেই অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর মত দেখা দিলেন আমাদের অধ্যাপক ডাঃ সুকান্ত চ্যাটার্জী। মাত্র কয়েক বছর হ'ল পাশ করে রিসাচ করছিলেন। মাস ছয়েক হ'ল আমাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। অনেকবার আমাকে বলেছেন পড়াশোনা বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে। এতদিন সময় হয়নি আমার। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো। অকপটে জানালাম নিজের অবস্থা। আমার ফাঁকি দেবার বহর দেখে তিনি প্রায় হতভম্ব। হয়তো বকাবকি করতেন কিন্তু আমার কাতর মুখ দেখে বোধহয় দয়া হ'ল। আমাকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। রোজ ক্লাশ শুরু হ'বার আগে সকাল বেলা ও সন্ধ্যায় ক্লাশ শেষ হ'বার পর পড়াতেন। বাড়ি থেকে নোট তৈরী করে আনতেন আমার জন্য। কিছুদিন পরেই Preparatory leave আরম্ভ হ'ল। তখন প্রায় সারাদিন ধরেই আমাকে পড়াতেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতো আমার। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত; মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসতো আমার। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে দুরূহ কোর্স সহজ হয়ে আসে। পরীক্ষার ভয়ও কেটে যায় ক্রমশ। সেইসঙ্গে যে নিরাশার অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল আমার জীবন তার মাঝেও বুঝি আলো ফোটে।

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। না, পরীক্ষাকে আর মৃত্যুদূত বলে মনে হ'চ্ছে না। অটল বিশ্বাসে, বেশ খুসী মনেই প্রতীক্ষা করছি তার জন্য। সেদিন পড়াচ্ছে পড়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি পরীক্ষার পর ক'দিন থাকবে এখানে?"—"তার পরদিনই যেতে হ'বে।"—"চণ্ডীগড়?"—"হ্যাঁ"। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ইতস্তত করে বল্লেন—"মালবিকা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম....।"

সেদিন হষ্টেলে ফেরার পথে বার বার শুধু মনে হ'চ্ছিল—এই ভাল, শোভনকে আমি পাবো না কোনদিন। আর তার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? থাকুক সে তার কর্তব্যবোধ, তার যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মরীচিকার পিছনে ছুটে হতাশা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবতোষ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট: সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সরকারি বাজেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে এবং সমগ্রভাবে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতটাকা লাভ হবে, সরকারি ব্যয় কোন দিকে কতটা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একটি হিসাব তৈরি করা। মোট ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটাও বাজেটেই দেখানো হয়। ঘাটতি মেটাতে হলে যদি নূতন কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার জন্য ব্যবস্থাও বাজেটে থাকবে। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সরকারি করনীতি ও ব্যয় থেকে দেশের উৎপাদন ও বণ্টনে কী পরিবর্তন হতে পারে, বা কী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার পরিচয়। সরকারি ব্যয় আজকাল কোন দেশেই শুধু প্রশাসন পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। সরকারি আয়-ব্যয় দেশের মোট আয়-ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং সরকারি আর্থিক পরিকল্পনা কম-বেশি আজকাল সব দেশেই গৃহীত। এদিক থেকে দেখলে বাজেট শুধু একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। বাজেট দেশের উন্নতিতে সরকারি নীতি ও প্রভাব কী হবে তার প্রতিফলন।

দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে আছে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত এবং বাঞ্ছনীয় ফলপ্রসূ বিনিয়োগ। আমাদের মত দেশে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাতে সরকারের অংশ ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, বর্তমানে ভারতে যা মোট নূতন বিনিয়োগ হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি সরকারি পরিচালনায়, আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি কৃষি, কুটির শিল্প, বেসরকারি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো আসে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে, কিন্তু তার জন্য যে বিনিয়োগের কাঠামো দরকার—যানবাহন, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাসায়নিক সার—সেটা সরকারি কর্মনীতির অঙ্গ হিসাবেই তৈরি হয়। আর্থিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণের আরম্ভ থেকে সরকারি বিনিয়োগ কোন কোন দিকে যাবে এবং কোথায় কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি নেওয়া হয়েছে। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি, যেখানে প্রত্যক্ষ লাভ বেশি না হলেও সমাজের উপকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুবিধা অনেকখানি। যেখানে বিনিয়োগের ফল পেতে দেরি হতে পারে, সেখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোই সঙ্গত, কারণ ঠিক এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সহজে আসবে না।

দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সরাসরি আয়-ব্যয় নীতির প্রভাবের প্রশ্নটি দুই ভাগ করে দেখা প্রয়োজন। সরকারি খাতে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হল প্রথম বিবেচ্য এবং দ্বিতীয় বিবেচ্য হল সরকারি করনীতি ও ব্যয় ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সরকারি আয়-ব্যয়কে যদি চলতি খাতে ও মূলধনী খাতে এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হলে সেটাকে সরকারি সঞ্চয় বলে অভিহিত করা যায়। যদি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে সরকারের আয় হয় দশ হাজার কোটি টাকা এবং চলতি খাতে ব্যয় হয় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা, তাহলে উদ্বৃত্ত পাঁচশ কোটি টাকা সরকারের সঞ্চয়—অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়টাকে মূলধনী খাতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মূলধনী আয় যোগ দিলে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই মূলধনী ব্যয়ের প্রধান অংশ হল আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা। মূলধনী আয় আসে সরকারের কাছে জমা দেওয়া নানা রকমের টাকা থেকে—যেমন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা পোষ্ট অফিসের আমানত—এবং নূতন তোলা ঋণ থেকে। এর অনেকটাই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের হস্তান্তর। রাজস্ব খাতে বা চলতি খাতে উদ্বৃত্ত আজকাল খুব একটা হয় না। কিন্তু এবারে ৬৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। আর সরকারের এবারকার মোট মূলধনী আয় ৬০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩২৪৮ কোটি টাকা আসবে নানারকমের জমা থেকে, আর বাকি ২৭৬৬ কোটি টাকা তোলা হবে ঋণ করে—দেশের বাজার থেকে ১০০০ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে ৮৯৪ কোটি টাকা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৮৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে। দেশের মধ্যে যে ঋণ তোলা হবে তার কতটা আসবে প্রকৃত সঞ্চয় থেকে আর কতটা

আসবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে (অর্থাৎ মুদ্রা-সম্প্রসারণ থেকে) সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আর্থিক পরিমাণ কতটা তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় থেকে। পরিকল্পনার ব্যয়ের বাইরেও সরকারি বিনিয়োগ হতে পারে—যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগে। আবার পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সাধারণ চলতি খরচ থাকতে পারে। তবু, এই পরিকল্পনা ব্যয় থেকেই সরকারি বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজবোধ্য চিত্র পাওয়া যায়। এবারে, অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮-এ, কেন্দ্রীয় খাতে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হবে ৫৭৯০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিকল্পনার জন্য যে সাহায্য দেবে সেটা ধরে নিয়ে। এ'ছাড়া রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের আয় থেকে আর্থিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ করবে সেটা ধরে নিলে মোট পরিকল্পনা ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এর মধ্যে কৃষি, জলসেচ, সারপ্রকল্প ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হবে ৩০২৪ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি সব দিকেই এবারে আগের বছরের চেয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকানো যেতে পারে। সরকারি আয়-ব্যয় নীতি, এবং বিশেষ করে করনীতি দিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় বাড়াবার কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। জীবন-বীমা বা প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডে টাকা জমা দিলে আয়কর অনেকটা মকুব হয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট কিনলে বা দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কিনলে তার থেকে যে আয় হয় তাতেও আয়কর অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। এবারে এদিক থেকে কোন নূতন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, কিন্তু যাদের আয় বছরে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা তাদের আয়কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে আয়কর দাতাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। এই ৮ লক্ষ লোক আগে আয়কর হিসাবে যে টাকাটা দিতেন তার সবটাই যদি সঞ্চয় করেন, তাহলে মোট সঞ্চয় বাড়বে প্রায় ১৬ কোটি টাকা, কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে তার সবটাই সঞ্চিত হবে এটা আশা করা অন্যায় হবে। অন্যদিকে, যাদের আয় দশ হাজারের বেশি তাদের উপরে আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঞ্চয় কমবে, তবে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে যে টাকাটা তারা দেবে সেটাও সঞ্চয়। এই জমার একটা অংশ এবারে ফেরৎ আসছে, সেটা আবার সঞ্চিত হবে না ব্যয়িত হবে বলা কঠিন। মোটের উপরে বলা যায় যে এবারকার বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য কিছু নূতন ব্যবস্থা বাজেটে নেওয়া হয়েছে। আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ করলে আয়করের সুবিধা দেওয়া হত। এবারে এই সুবিধা প্রসারিত করে সব রকমের শিল্পেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবল তালিকাভুক্ত ৩৪ টি শিল্প বাদে। যেসব শিল্প এসব সুবিধা পাবে না, তাদের মধ্যে আছে কিছু বিলাস দ্রব্য (যেমন মদ, সিগারেট, প্রসাধনের জিনিস ইত্যাদি) এবং এমন আরো কয়েকটি শিল্প যেখানে এজাতীয় সুবিধার কোন প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নূতন ক্ষুদ্রশিল্পকে আয়করের কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ভারতে উদ্ভাবিত কারিগরির পদ্ধতি ব্যবহার করলেও আয় কর কমানো হবে। যদি কোন সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো 'রুগ্ন' শিল্পকে নিজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাহলেও আয়করের সুবিধা পাওয়া যাবে। 'মূলধনী লাভ'-এর ক্ষেত্রে করমকুবের সুবিধা আগে পাওয়া যেত শুধু বসত বাড়ি বিক্রির লাভের বেলাতে—এবারে সে সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। আশা করা যায় যে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিযুক্ত হবে। সম্ভবত এই টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হবে। তাতেও বিনিয়োগেরই উপকার।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে—যেমন কোন কোন ধরণের সূতা বা দেশলাই। যেক্ষেত্রে নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র শিল্পকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সবশুদ্ধ বলা যায় যে এবারকার বাজেটের মূলনীতি হল ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বিশেষ করে সেই ক্ষুদ্রশিল্প যদি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই নীতি আজকাল প্রায় সকলে বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের সমস্যা দূর করতে হলে বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারণের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এবারকার বাজেটে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা, বা বেসরকারি বিনিয়োগের মূল সমস্যা সমাধান করতে হলে করনীতি ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সে সব ব্যবস্থা কী হবে সেটা নূতন পরিকল্পনা নীতিতে স্থির হবে। এ বছরের বাজেট নূতন সরকার মাত্র তিনমাস সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন, অতএব এর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। আগামী কয়েক মাসে নূতন পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা কী রকম হবে তার একটা খসড়া তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এবং তখন সময় আসবে নূতন করনীতি এমন ভাবে তৈরি করবার, যাতে সম্ভাব্য সব উপায়ে সঞ্চয় বাড়ানো যায় এবং দেশব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণের পথে বিনিয়োগকে চালিত করা যায়।

অমর নাথ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট কতটা জনতা-বাজেট

প্রশ্নটার মধ্যে কতখানি কৌতূহল আর আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমার জানা নেই তবে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে কিছুটা চমকের সৃষ্টি করেছে। জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল সেগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবারের এই কৃষি উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপরে যে পরিমাণ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারের বাজেটে মধ্য ও উচ্চ আয়, সম্পন্ন ব্যক্তিদের যতটা হতাশ হতে হয়েছে ততটা সুবিধা মিলে গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের যাঁদের মাসমাইনের ঊর্দ্ধসীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। আর একটা সুবিধে, পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্পে বিশেষত কৃষি আর সেচ, রাস্তাঘাট আর পানীয় জল, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। এবারে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বহাল উৎপাদন শুল্কের উপরে অতিরিক্ত ১ শতাংশ বৃদ্ধি, এর পেছনে সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়।

বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি কবলিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর ভারে প্রপীড়িত আর্থিক কাঠামোয় নতুন করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। তবুও এবারের বাজেটে দুটো আপাত বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রথমত সামগ্রিক করের পরিসরে সম্ভাব্য সংকোচন। আর দ্বিতীয়ত ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা ন্যূনতম পর্য্যায়ে সীমিত করা। আগামী আর্থিক বছরে সংগ্রহযোগ্য কর আদায়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হ'ল ১১০ কোটি টাকা। আর ঘাটতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হ'ল ৯২ কোটি টাকা আর পরোক্ষ কর হ'ল ৫৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই শুধু বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাৎসরিক ৮০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে কোম্পানিগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানিগুলির সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নে গতিবেগ সৃষ্টি করা। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্যই হেরফের ঘটানো হয়েছে। তাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তরে করজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে আর সেইসঙ্গে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী হ'ল শিল্পগত মন্দা ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করে বেশ কয়েকবারই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে ও বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটে। আর এজন্যই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে আর্থিক বিনিয়োগে নানারকম সুবিধা প্রদান করে একটা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আর্থিক ও রাজস্বগত অনুদান বা মঞ্জুরি মারফত সুযোগ সুবিধে শিল্পে কেন দেওয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে গতানুগতিক বা মামুলি প্রথায় শিল্পে কোনও প্রকার সাহায্য ফলপ্রসূ হবেনা। বিগত কয়েকবছরের ইতিহাস তাঁর এই যুক্তি প্রমাণ করছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্পের (Investment Allowance Scheme) সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দাবী পূরণ করেছেন। শুধুমাত্র ৩৪-টি স্বল্প-গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শিল্পে প্রচলিত ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় একটা প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিতে এক বছরে

মোট ২১৩ কোটি টাকার যত নতুন বিনিয়োগ ও মূলধন সম্প্রসারণ ঘটবে।

শিল্পক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই সুবিধে মিলবে। রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইউনিট যদি চালু ইউনিটগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি ঘটায় তবে সেক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্পের সঞ্চিত ক্ষতির তহবিল চালু সংস্থার মুনাফার সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। আর একটি সুবিধে হ'ল যে, কোন কোম্পানি যদি স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে লগ্নীব্যয় করে তবে সরকার তাকে করযোগ্য মুনাফায় কিছুটা রেহাই অনুমোদন করবেন।

বর্তমান বাজেটে আশু সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সুষ্ঠু উন্নয়নের একটা পথনির্দেশ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান-কালের বার্ষিক ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের তাগিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধনে অর্থমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক দুটি শক্তি হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা সংকুচিত করা সম্ভব হয়েছে। আর সেইসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে সরকারী অর্থব্যয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাজস্ব ব্যয় ও দেশরক্ষা খাতে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করে ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বিন্যাস ও চালু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে একটা গতিসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবে প্রত্যেক বাজেটের মত এবারের বাজেটও কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সংস্থাগুলি উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টি করা দরকার। আগামী বছরে পরিকল্পনা ব্যয় ২৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৯,৯৪৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এর প্রকৃত পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া শিল্প হ'ল অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। অনেকের মতে শিল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে কৃষির উপর সহসা গুরুত্ব প্রদান করায় জাতীয় উৎপাদন ক্রম-ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ঘাটতি ব্যয় প্রসঙ্গে আর একটি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার সুস্পষ্ট কোনও হদিস নেই। যদি তা মামুলি সরকারী ঋণ পত্রের (Ad-hoc Securities) মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে নোট ছাপানোরই নামান্তর। তবে এটুকু মাত্র আভাস মিলেছে যে এক বিশেষ সিকিউরিটির মাধ্যমে এই টাকা তোলা হবে। কিন্তু তাহলেও মুদ্রাস্ফীতির সমূহ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়না। তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখবার একটাই পথ এক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্যে যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তাহলে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ না বেড়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মোটের উপর বাজেটের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে যে চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে করের হেরফের ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবদ্ধ অথচ উন্নয়নমূলক বাজেট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের রেহাই দান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতপক্ষে অর্থমন্ত্রী একটি পুনর্বন্টনমূলক করবিন্যাস প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সর্বাধিক রাজস্ব (৯২ কোটি) প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করছেন। সেসঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়স্তরের বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উপরে বাজেটের গুরুত্ব জনতা সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নবরূপায়ণ নির্দেশ করে। বিশেষত এই পথে কৃষিই হবে ভাবী অর্থনীতির উন্নতির পরিমাপক ও উন্নতি বিধায়ক। আর শিল্প তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

রুমমেট

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও অবহেলার গ্লানি কুড়োতে পারিনা আর।

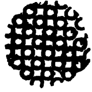
কিন্তু রুমের দরজার কাছে এসেই চিন্তাধারা থেমে গেল। দরজা ভেজানো. অর্থাৎ শকুন্তলা রুমেই আছে। ওর কথা মনে হ'তেই রক্ত হিম হয়ে এলো যেন। কি করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো সেইটাই সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ও যদি জানতে পারে? তখনি আবার মনে হ'ল, জানলোই বা, লুকোচুরির কিই বা আছে এতে? আজকেই বলবো ওকে সব কথা। জানিয়ে দেবো শোভন চলে গেছে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত।

একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দেখি শকুন্তলা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "কুন্তী কি হয়েছে রে?" চমকে মুখ তুলে তাকালো শকুন্তলা। হঠাৎ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হুড়মুড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরলাম টেবিলটাকে। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ—দেয়ালগুলো চোখের সামনে দুলছে।

শকুন্তলার বিছানার উপর শোভনের ফটো। ফটোর কাঁচে তখনো টল টল করছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা



পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে ২৪ জুন, শুক্রবার ১৯৭৭ সাল। এপ্রিল মাসে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সপ্তম বিধানসভা ভেঙ্গে দেন। মে মাসে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বিধান সভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১৪ জুন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা ও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি-পি-আই(এম)-এর নেতৃত্বে ছয়দলের বামফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ২১ জুন সি-পি-আই(এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন আরও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গে ২২ জনের মন্ত্রিসভায় বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছিলেন। সেবার সব দল মিলিয়ে ও নির্দলদের নিয়ে মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৮৩৩ জন, ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭,৯৪৬ টি। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে অষ্টম বিধানসভার এই যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে মোট ২৯৪ টি আসনের জন্য (লক্ষ্যণীয়, ১৪ টি আসন বেড়েছে), নির্দল প্রার্থীদের ধরে মোট প্রার্থী ছিলেন ১,৫৭১ জন। ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯,০৬২। এবার একটি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া জেলার আরসা কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থীর নির্বাচনের ঠিক আগেই মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন। সুতরাং ১৯৭২ সালের ২৮০ জন সদস্যের তুলনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ২৯৩ জনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যখন এপ্রিল মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন মোট ২৮০ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৬, সি পি আই-এর ৩৫, আর এস পি-র ৩, সংগঠন কংগ্রেস ২ গোর্খা লীগ ২, এবং নির্দল ৫। যদিও সি পি আই (এম) ১৪ টি আসনে, এবং এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়লাভ করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই সদস্যরা বিধানসভা বর্জন করেছিলেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই ২৯৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সি পি আই (এম) দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর সিপি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে সি পি আই (এম) প্রার্থী দেন ২২৪ টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬ টিতে, আর এস পি ২৩, ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ) ৪, আর সি পি আই ৩ ও বি বা কং ৩টি আসনে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে তারপর চারটি নির্বাচনে হয় সি পি আই দল অপর কোন বামফ্রণ্ট কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে আসন ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, এবার এঁরা

শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন



একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন ; সি পি আই প্রার্থী দিয়েছিলেন ৬২ টি আসনে। তেমনি এস ইউসিও এবার কোন বামফ্রণ্টে যোগ না দিয়ে নিজেরা ২৩ টি আসনে লড়াই করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় নকসাল-পন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল)-এর একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের লড়াই-এ সামিল হওয়া। নকশাল নেতা শ্রী সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করেন এবং এঁদের তিনজন নেতা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এঁরা তিন জনই মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ রানা গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর দুজন অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্বভারতীয় সি এফ ডি দল জনতা দলের সঙ্গে মিশে গেলেও অপর কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সি এফ ডি-র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৮০ জন প্রতিবন্দ্বির মধ্যে মাত্র একজন—শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এবার মোট চার জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন সি পি-আই (এম) সমর্থিত।

ছয় পার্টির বামফ্রন্ট এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় এসেছেন। ১৯৭২-এর বিধানসভায় যদিও ২৮০ জনের মধ্যে ২১৬জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসও বিপুল সংখ্যা-ধিক্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন, এবারকার বামফ্রণ্টের গণসমর্থন তার চেয়েও বিরাট—সর্বকালের রেকর্ড। বামফ্রণ্টের মোট সদস্যর সংখ্যা ২৩০, এঁদের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর ১৭৮ (একজন সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে), ফ: ব্লু:এর-২৫, আর এস পি-র ২০. ফ: ব্লু: মা: ও আর সি পি আই ৩ জন করে এবং বি বা কং ১ জন সদস্য। জনতা দল পেয়েছেন ২৯ জন সদস্য। কংগ্রেস ২০ জন। সি পি আই মাত্র ২ জন। অন্যান্য দলের হিসাব: এস ইউ সির ৪, গোর্খা লীগ ২, সি পি আই (এম-এল), মুসলীম লীগ ও সি এফ ডি ১ জন করে এবং নির্দল ৩ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামফ্রণ্ট ২৩০ টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে মোট মাত্র ৬৩ জন সদস্য থাকলেন। গরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসাবে জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র। কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হয়েছেন ডা: জয়নাল আবেদিন।

এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গণ্য করেছেন। এই মোট বিধিসম্মত ভোটের মধ্যে একক বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ, যদিও ১৭৮ জন প্রার্থী (বিধানসভার মোট নির্বাচিত ২৯৩ জনের শতকরা ৬১ ভাগ) নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। বামফ্রণ্টের অপর পাঁচটি দল একত্রে ৫২ টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন, এই দল কটির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ১১ ভাগ।

জনতা দলের প্রার্থীগণ মোট ২৮ লক্ষের কিছু বেশী ভোট অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী পেয়েছেন, এই দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা ২৯ হওয়ায় দল বিধান-সভার মোট আসনের শতকরা দশটিও লাভ করতে পারেন নি। কংগ্রেস দল পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ভোট এবং মাত্র ২০ টি আসন। অর্থাৎ বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২২½ ভাগ ভোট পেলেও আসনের হিসাবে সে-সমর্থন প্রতিফলিত হয় নি। জেলার হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে জনতা প্রার্থীগণ কুচবিহার, ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই কটি জেলায় একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেন নি। তেমনি কংগ্রেস কোন আসন পাননি কলকাতা, হাওড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী প্রভৃতি সাতটি জেলায়। জনতা দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছেন—৩৭ টির মধ্যে ১৭—মেদিনীপুর জেলায়, আর কংগ্রেস পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী—১৯ টির মধ্যে ছ টি—মুর্শিদাবাদে।

সকলেই জানেন জনতা দল নবাগত-হলেও এই দলের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের পরিক্রমন অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি আই (এম) ও কংগ্রেসের উত্থান-পতন কৌতূহলী পাঠক মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন, সন্দেহ নেই। যদিও অতীতের হিসাব থেকে জনতা দলের কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় তথাপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবরণ থেকে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এই সংকলন ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করা হয়েছে কারণ ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত সি পি আই ভাগ হবার আগে পৃথক দল হিসাবে সি পি আই (এম)-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি হিসাবে সি পি আই এবং আরও কয়েকটি দলের উল্লেখও করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ২২ জন সদস্যের মন্ত্রিসভায় —সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের চার, আর এস পি-র ৩ ও আর সি পি আই-এর ১ জন। সি পি আই (এম)-এর শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল—দুবারই সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকটি দল যুক্ত হয়েছিল। দুবারই শ্রী বসু উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই বর্তমান

মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দশবার সরকারের বদল হল। বর্তমান বিধানসভা তথা নতুন সরকারের কথা বলতে হলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার খাতিরে আগের সরকারগুলির উল্লেখও প্রয়োজন:

১। মার্চ ১৯৬৭—নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

২। নভেম্বর ১৯৬৭—জানুয়ারী ১৯৬৮ পি. ডি. এফ. সরকার।

৩। জানুয়ারী ১৯৬৮—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাষ্ট্রপতি শাসন।

৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার

৫। এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৬। মার্চ ১৯৭১—এপ্রিল ১৯৭১ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার

৭। এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৮। মার্চ ১৯৭২—এপ্রিল ১৯৭৭ কংগ্রেস সরকার।



সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনৈক ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

৯। এপ্রিল ১৯৭৭—জুন ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির শাসন।

১০। জুন ১৯৭৭— বামফ্রণ্ট সরকার।

গত দশ বছরে দশবার সরকার পরিবর্তন কী সূচীত করে? বাঙ্গালীর চপলচিত্ততা? নাকি, সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা? রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙ্গালী অস্থির কারণ সে অধীর আগ্রহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা চাইছে যা তাকে শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি দেবে তাই নয়, আরও বেশী করে দেবে স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার নিরঙ্কুশ সুযোগ।

দল	১৯৬৭		১৯৬৯		১৯৭১		১৯৭২		১৯৭৭	
	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)
কংগ্রেস	৪১	১২৭ (২৮০)	৪০	৫৫ (২৮০)	৩০	১০৫ (২৮০)	৪৯	২১৬ (২৮০)	২২.৫	২০ (২৯৩)
সি পি আই (এম)	১৮	৪৩ (১৩৫)	২০	৮০ (৯৭)	৩৪	১১৩ (২৩৮)	২৮	১৪ (২০৮)	৩৬	১৭৮ (২২৪)
সি পি আই	৭	১৬	৭	৩০	৯	১৩	৮	৩৫	—	২
ফঃ বঃ	৪	১৩	৫	২১	৪	৩	১	০	—	২৫
আর এস পি	২	৬	৩	১২	২	৩	২	৩	--	২০
এস ইউ সি	০.৭	৪	১.৫	৭	২	৭	১	০	--	৪
কংগ্রেস (সং)	—	—	--	—	৬	২	১	২	--	--

পল্লীউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, যোজনায় পেট্রোলিয়ামের জন্য বরাদ্দের হিসেব গত বছরের ৪৮৫ কোটি টাকাকে আরো বাড়িয়ে এ বছর ৬৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল-ভাগ ও স্থলভাগ অনুসন্ধান চালানোর জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে ৪৫১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি বোম্বাই হাই ও বেসিন ক্ষেত্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ১ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছাবে আশা করা যায়। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮৮৯ লক্ষ টন।

২০০ মেগাওয়াটের একটি নতুন লিগনাইট-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নাভেলি লিগনাইট করপোরেশনকে দেওয়া হবে ৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎঘাটতির কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩০২ কোটি টাকা রেল পাবে। রেলের বাজেট বরাদ্দ হল ৪৮০ কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশী সংখ্যক ডাকঘর চালু করা, এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুযোগসুবিধা প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুপরিচালনার ফলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যোজনায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পরে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ হতে পারে। ঐসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁত শিল্পের জন্য ২০ কোটি এবং রেশম চাষের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সময় সংক্ষেপ এবং চালু প্রকল্পগুলিতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত রাখার দরুণ 'আমাদের ঘোষিত নীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি বলে শ্রী প্যাটেল সংসদে মন্তব্য করেন। এছাড়া সম্প্রতি পুনর্গঠিত যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উঠতে পারেননি বলেও তিনি জানান। শ্রী প্যাটেল বলেছেন, দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন, হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি, বেকারী দূরীকরণ, এবং বিস্তি-বস্তী অপসারণ সহ অন্যান্য সমাজসেবার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি এমন একটি বাজেট রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের দর্শন, কর্মসূচী ও নীতিগুলির যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নতির জন্য শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের উন্নতির জন্য শতকরা ৫.৪ ভাগ, পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির জন্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত ব্যয়-তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে আনুপাতিক হারে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, আর এই ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংকুচিত করা হচ্ছে শিল্প (বিশেষ করে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য, লৌহেতর খনিজ এবং পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শিল্প) এবং সমাজকল্যাণ (বিশেষত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা) বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দকে। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ (৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হারে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, গ্রামীণ পানীয় জলের সংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, নগর উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা, ভূমিসংরক্ষণ, পশুপালনশিল্প, মৎস্যচাষ, বনসংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্পের বিকাশ, ইলেকট্রনিক্স, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিমান পরিবহণ ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই বৎসরের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের দিক থেকে নজর খনিকটা সরিয়ে এনে হালকা শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষি, সেচ, বনভূমি ও জলাধারের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষের জীবিকার পথকেও সুগম করার চেষ্টা রয়েছে এই নূতন ব্যবস্থায়। দেশের স্বয়ংম্ভরতা বাড়াবার জন্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশাগত পেট্রোলিয়ামের উপর একান্ত নির্ভরশীল রাসায়নিক শিল্পগুলির বিস্তারে সরকারী আগ্রহ বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো এবং সেই ব্যয়কে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাই বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে সাধারণ মানুষের বেকারি ও আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পাবে এবং দেশে বিদ্যুৎ ও তেলের ঘাটতি কিছু পরিমাণে মিটবে বলে আশা করা যায়। তবে একটি মাত্র বাজেটের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হবে এমন আশা সরকারী মহলও নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের দিকে সামান্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপকেই আপাতত যথেষ্ট বলে ভাবা উচিত।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী

আপনার আয়কর কত দাঁড়াল

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেহাইয়ের সীমা আট হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু যে সমস্ত করদাতার করযোগ্য আয় দশহাজার টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে আট হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সবটাতেই ১৯৭৬-৭৭ সালের করহার অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হবে। যাদের বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার সামান্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রান্তিক (Marginal) সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কোম্পানীগুলি বাদে অন্যান্য সকল শ্রেণীর আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনের শতাংশ করা হয়েছে। পনের হাজার টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক জমা আরো দু বছর চালু থাকবে।

বার্ষিক দশ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু আয় দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে যেমন দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্ত্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই পাওয়া যাবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। বাড়ীভাড়া ভাতাও আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। মালিক পক্ষ যদি কোথাও তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটর গাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেহাই পাবেন না।

যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবন বীমায় টাকা জমান তাদের জমার প্রথম চারহাজার টাকায় কোন আয়কর দিতে হবে না। তার সমগ্র আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। এ বিষয়ে নিয়ম হল পরবর্ত্তী জমা ছ হাজার টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী জমানো টাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যাবে। কিন্তু তাই আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বেতনের সব টাকা জমানো চলবে না। মোট বেতনের (বেতন থেকে যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ যে ছাড় পাওয়া যায় তা বাদ দিয়ে যেটা থাকে) শতকরা ৩০ ভাগের বেশি জমানো টাকা কর রেহাইয়ের হবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ আয়করদাতা আছেন। জনতা সরকারের বাজেটে কর রেহাইয়ের সীমা দুহাজার টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার আয়করদাতা এখন আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করহার ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করে দিলেন। জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সারচার্জ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোতে করহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ শতাংশ।

প্রথম জনতা বাজেটে ১০,৫৫০ টাকার বেশি আয়কারী ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করের বর্ত্তমান ও নূতন হার অনুযায়ী হিসাব তালিকা নিচে দেওয়া হল:—

[illegible] হিসাবে) আয়	আয়কর (দশ শতাংশ সারচার্জ সহ বর্ত্তমান হারে)	আয়কর (প্রস্তাবিত পনের শতাংশ সারচার্জ সহ)	করবৃদ্ধি +	হ্রাস
১০,০০১	৩৩০	নাই	–	— ৩৩০
১০,৫০০	৩৮৩	৩৮৫	+ ২	
১১,০০০	৪৯৫	৫১৮	+ ২৩	
১২,০০০	৬৬০	৬৯০	+ ৩০	
১২,৫০০	৭৪৩	৭৭৬	+ ৩৩	
১৫,০০০	১,১৫৫	১,২০৮	+ ৫৩	
২০,০০০	২,১৪৫	২,২৪৩	+ ৯৮	
২৫,০০০	৩,৫২০	৩,৬৮৩	+ ১৬৩	
৪০,০০০	৯,৫৭০	১০,০০৩	+ ৪৩৩	
৫০,০০০	১৩,৯৭০	১৪,৬১১	+ ৬১১	

এই তালিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের কর বৃদ্ধি কতটা তা বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোররজী দেশাইকে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়করমুক্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে এটা চার হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারতেন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাৎসরিক ১৬,৯৪৪ টাকা আয়েও এক পয়সা আয়কর না দিয়ে পারা যাবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৯০০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:--

বেতন	১০,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মাগ্গী ভাতা	৩,৮৭৬ টাকা
মোট	১৬,৯৪৪ টাকা

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় দশ হাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৬,৯৪৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাঁকে অবশ্য সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক:

	মোট আয়	১৬,৯৪৪ টাকা
(ক)	বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ বাদ	১,৬২০ টাকা
		১৫,৩২৪ টাকা

অফিস যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ বাদ—
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা

(খ)	বাকী ৫,৩২৪ টাকার জন্য	৫২৩ টাকা
	মোট	২,৫২৩ টাকা

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়। (গ) জীবনবীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ ৩,০০০ টাকা

ছোট ছাড় ৭,১৪৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৬,৯৪৪ টাকা থেকে ৭,১৪৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৯,৮০১ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না। এছাড়াও পূর্ব্ববর্তী বাজেটগুলিতে মধ্য-বিত্তদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—যেমন মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের কর্ম-চারীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তান কিংবা নির্ভরশীল ভাই বোনদের জন্য যে ব্যয় তাতে রেহাই দেওয়া—জনতা সরকারের বাজেটে এ সব সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন, যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, ব্যাংকে রাখা টাকা আয়-কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং কারাবাসও করতে হবে। আইন ব্যাপারে আয়কর বিভাগকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। অপরদিকে আয়কর বিভাগকে এও দেখতে হবে সৎ আয়কর দাতারা কোন ভুল করে ফেললে তাদের যেন কোন হয়রানি না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিভাগও চান করদাতারা যেন নিজেদের আয়ের রিটার্ণ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পূরণ করে কর বিভাগে জমা দেন। অগ্রিম কর প্রদান করে, স্বনির্দ্ধারিত কর (Self assessment tax) ঠিক সময়ে জমা দিয়ে, হিসাব ঠিকমত রেখে (দুরকম খাতা নয়), করবিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে পার্মানেণ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে করদাতারা আয়কর বিভাগকে সাহায্য করতে পারেন। এখন সব করদাতাকেই পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর তাঁদের চিঠিপত্রে; রিটার্ণফর্মে এবং চালানে উল্লেখ করতে হবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপো-রেশনের সঙ্গে যোগাযোগে যেমন কন-জিউমার নাম্বার দিতে হয়; আয়কর বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে তেমনি পার্মানেণ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে।

নিজেদের হিসাব পত্রের খাতা যথাযথ ভাবে রাখাও করদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, হিসাব-রক্ষক, শিল্প বিষয়ক পরামর্শ-দাতা, প্রভৃতির আয় যতই কম হোকনা কেন, হিসাব তাঁদের রাখতেই হবে। ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেক করদাতা যাঁদের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার উপরে বা ব্যবসায়ে বার্ষিক বিক্রয় আড়াই লাখ টাকার বেশি তাঁদেরও অবশ্যই হিসাব রাখতে হবে।

১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আয়কর আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে হিসাব বহির্ভূত ব্যয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি কোন আয়কর দাতা এমন কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে আয়কর অফিসারের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে তিনি না পারেন তাহলে সেই ব্যয় তাঁর আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে। আয়কর রিটার্ণ ফর্মের চতুর্থ অংশে এখন কর দাতাকে বাড়ীভাড়া, যাতায়াত, বিদ্যুৎ খরচ, ক্লাব এবং ভ্রমণ ও ছুটি কাটান সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের হিসাব দিতে হবে।

আয়কর আইনকে ভালভাবে জেনে নিজের সঠিক আয়কর দিয়ে দিলে করদাতারা নির্ভীক ভাবে থাকতে পারেন—আয়কর বিভাগের কোন চিঠি পেলেই আর ভয়ে বক্ষ-কম্পন সুরু হয় না। অবশ্য এই আইন খুবই জটিল এবং তাই বর্তমান অর্থমন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল এই আইনকে সরল করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।



আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা

কান্তিপদ ঘোষ

আবার এসেছে আষাঢ়। কাজল মেঘের কালো কোমল ছায়া, ঘনিয়ে আসছে থেকে থেকে। ঝর ঝর মুখর বাদল দিন। মাঠের পর মাঠ থৈ থৈ করছে বৃষ্টির জলে। কিন্তু আর একটা পরিচিত দৃশ্য এই দৃশ্যপটে নেই। সেটা হল টোকা মাথায় দিয়ে দলে দলে সকল কৃষকদের ধান রোয়ার ব্যস্ততা। কারণ সকলের চারা তৈরী হয়ে ওঠেনি। জলদি রোয়ার সুবিধাটুকু হাতছাড়া হয়ে গেল। এমন আর একটি ছবি। শরৎ শেষে হিমের পরশে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সে আসছে। কিন্তু মাঠে মাঠে তার আয়োজন কি সারা হয়েছে? কোথাও কিছু মাঠে চাষ পড়েছে, কোন মাঠে এখনও ধান তোলা হয়নি, কোন মাঠে ধানে কাস্তেই চলে নি। আবার কোন মাঠে এখনও ধানে জল দাঁড়িয়ে আছে। খরিফ মরশুমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধান রোয়ার ফলে শীতের ফসলও নাবি হতে লাগল। ফলে এই বাংলার স্বল্প স্থায়ী মূল্যবান শীতের অনেকটাই অপচয় হল। এই ক্ষতিগুলো কি এড়ান যায় না? হ্যাঁ যায়। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প —যৌথ বীজতলা।

ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরসা করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করে চাষীরা মাঠে বীজ ফেলেন। সাধারণত চাষীরা তাদের নিজের নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকু ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় অনেক সময়েই সময়মত হয় না। নাবি বৃষ্টিপাত, ক্যানেল বা সেচের জল পেতে বিলম্ব বা অন্যান্য নানাবিধ কারণ অনেক সময় ধান রোয়া বিলম্বিত করে। এই জন্য বর্ষা নামার ৮–১০ সপ্তাহ পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হচ্ছে:—

(১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয়।

(২) চারার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। বেশী পাশকাঠি বের হয় না এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল এসে যায়।

(৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) ফুল অবস্থায় বা পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

(৫ সেচের জলের অপচয় হয়।

(৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়।

এই সব কারণগুলি মিলে খরিফ মরশুমে ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং সেচের জলের সদ্‌ব্যবহারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের যৌথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্শারি বা যৌথ বীজতলার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট আগে সেচের সুবিধা-যুক্ত একটি জায়গায় সকলে একসাথে নিবিড়ভাবে বীজতলা করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর, কূপ বা নলকূপের কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের জল পাওয়ার ৪–৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল দু একটি জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচা বা সময় কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়া হবে তার কাছাকাছি বীজতলা তৈরী করুন। ধানের চারা বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা করাই সুবিধাজনক। অনেক সময় ধানের চারা বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু বীজতলা বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, যে কৃষকের জমিতে এই বীজতলা হবে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে—

(১) পূর্বে উল্লেখ করা ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

(২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে কৃষকদের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে।

(৩) এক সাথে বীজ তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়া সারা হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের জমি তৈরী ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বহু ফসলী চাষেরও প্রসার হবে।

(৪) ধান আগে ওঠার জন্য জল কম লাগে। ফলে একই জাত বা একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ

সেবিত এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ ও সার দেওয়া, রোগ-পোকা দমনের, নিড়েন কাটা ও তোলার সুবিধে হবে তাই নয়, সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় তৈল বীজ, ডাল শস্য ইত্যাদি করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে।

(৫) শস্যরক্ষার খরচা অনেক কম হয়। কারণ এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর মূল জমিতে রোয়া ধানে প্রাথমিক ওষুধ দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার ফলেও মজুর ইত্যাদি খরচ কম লাগে। ফলনও বৃদ্ধি পায়।

(৬) অনেক সময় নাবি রোয়া ধান জলচাপ হওয়ার ফলে ভাল পাশ-কাঠি ছাড়ে না, গুছির সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, যৌথ বীজতলা করে জলদি রুইতে পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানো সম্ভব।

(৭) রোয়া দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এই সব আগাছা, যা সহজেই বাড়বার ক্ষমতা রাখে, স্থান, আলো ও সারের ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সারেরও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। আমাদের চাষীরা বলেন আষাঢ়ের রোয়া ধান 'চার পোয়া' হয় অর্থাৎ মরশুমের পুরো সময়টা ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার গাছ পুরো পেতে পারে।

(৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং অন্যান্য নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। কারণ এই যৌথ প্রকল্পে এক সাথে অনেক চাষী অংশগ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞান-সম্মত সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধান চাষে অখ্যাত রাজ্যগুলির ধান্যো-ৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি থেকে আশা করা যাচ্ছে 'ধান্য-বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা গেছে। এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতলা বা কম্যুনিটি নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

নাম্বারি সংবাদপত্র, দেশী পশম ইত্যাদির উপর।

এছাড়া ঢালাওভাবে ২ শতাংশ কর ধার্য হয়েছে সব জিনিষের উপর যেগুলি অন্যভাবে আবগারী শুল্কের আওতায় পড়েনা। এই শুল্কের হার আগের বাজেটে ছিল ১ শতাংশ এবং ঐ বাজেটেই এই শুল্ক প্রথম বসানো হয়। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্ববর্তীর পথই একেত্রে শুধু অনুসরণ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর উপরও আরও একটু এগিয়ে গেছেন। মনে হয় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটা এত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার কলাফল বিশেষ খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এমন ঢালাওভাবে আবগারী কর ধার্য করলে তা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং সেগুলার যত কম থাকে ততই বাঞ্ছনীয়।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত করব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত ব্যয়সংকোচ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির কথা বললেও মোট ধার্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেটের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশী। ফলে নানাভাবে কর সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবগারী কর, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। সেদিক থেকে নতুন বাজেট কোনও সুবিধার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। হাতে কাজ করার ছোট যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কি করে বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় পড়ে বোঝা যায় না। এদের মূল্যবৃদ্ধি মানেই অন্য অনেক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি।

সবশেষে করব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তার জটিলতা। একথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে পূর্বে নিযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর কি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তিনি কিছুই জানান নি। যেভাবে ১০,০০০ টাকার উপর আয়করের প্রান্তিক ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে বা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেভাবে যন্ত্র চালিত বস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,—সেসবই এই জটিলতার উদাহরণ। এই ধরনের জটিলতার নানা নিদর্শন কর প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। এতে করদাতারা বিভ্রান্ত হন। সরকারের রাজস্ব আদায়ের খরচ বাড়ে, আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই জটিলতা পরিহার না করতে পারলে কর-ব্যবস্থা নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আজকের নাটক

'জগন্নাথ' ফাঁসির দড়ি গলায় নেবার আগে বলেছিল 'আমার পাশে বিপ্লবীরা থাকলে দাসবাবুকে আমিও মারতে পারতাম। পারবে, পারবে নন্দ ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে। ধ্যুস্ !'

নাটকের চরম মুহূর্ত এটিই, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও গভীরতার নির্যাসটুকু বেরিয়ে এসেছে এই একটি সংলাপে। নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনি ছোট ছোট কিছু চিত্রকল্পে ও সংলাপে প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ের মোড়কে আজকের, একবারে এই আজকের কয়েকটি শ্রেণীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন 'জগন্নাথ' নাটকে একাডেমির মঞ্চে। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে, তার নিপুণ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বিস্ময় জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'অমূল্য রতন' বিশেষণ দুটি নাটকের প্রধান চরিত্র 'জগন্নাথ'কে দেওয়া যায় অনায়াসেই, অবশ্যই বিনা কারণে নয়। নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় (অনুপ্রেরণা: লু শুনের একটি ছোট গল্প) শ্রেণী পর্যায়ের একবারে শেষ ধাপটিতে নেমে এসে যাঁকে তাঁর এই নাটকের মধ্যমণি করলেন সে মেরুদণ্ডহীন হাবা-গোবা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাহীন এক জনমজুর। সরল সাধাসিধেও বটে জগন্নাথ। ভালোবাসা এবং কর্মক্ষেত্র দু জায়গাতেই সে পাথরের মত নীরব, কিন্তু ভেতরে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুনে জলন্ত। আমরা সবাই তো তাই।

এই জগন্নাথকে ঘিরে রয়েছে গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর, যিনি জমিদারের মাস-মাইনের চাকর, যাঁর দেওয়া 'কিসব' খেয়ে মেয়ে নলিনীর 'ভর' হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি এমন চরম আঘাত আর কেউ দিয়েছেন কি? আছে জমিদার দাসবাবু যাঁর কাছে 'মেয়েছেলে' মানেই উপভোগের বস্তু, আছেন বিপিনবাবু যিনি এইসব ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথদের চোখে 'আত্মার' ঠুলি পড়িয়ে ঘোরাতে চান, আছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মত দালাল, আর আছে বরুণের মত সহৃদয় বিপ্লবী, সশস্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী বটে কিন্তু বিপ্লবের আসল শক্তি এই সব 'জগন্নাথ'দের তাঁরা দলে নিতে চাননা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তাঁরা। 'জগন্নাথ' বরুণদের কাছে ঘুমন্ত।

পাশাপাশি নন্দকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। নন্দ জগন্নাথের মতই জন-মজুর। একই শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা, কিন্তু নন্দ হাবাগোবা নয়, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে তৎপর। তাই যে জগন্নাথকে

আমরা সবাই 'জগন্নাথ'

টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে ভেড়ে। অবশ্য বিপ্লবীরা বলেন 'ওকে দলে নিতেই হোল'। আসলে জগন্নাথও নন্দ হতে পারত, সঠিক নেতৃত্ব পেলে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে পূর্ণ মজুরী আদায় সে করত, বাল্য প্রেমিকা মনোরমাকে দাসবাবুর 'খাদ্য'হতে দিতনা জগন্নাথ। করতে পারত আরও কিছু।

কিন্তু তা আর হল কই! দেশের শতকরা নব্বুই জন নাগরিক রইল নেতৃত্বহীন, হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকোর মত। অথচ এরাই আসল শক্তি, হাতিয়ার। সমাজ বদলের যজ্ঞে এরাই প্রকৃত পুরোহিত।

'জগন্নাথ'-এর মৃত্যুর পরও যখন বিপ্লবীদের মধ্যে তার চরিত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভেদ জাগে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবটা ছিল কেমন তাসের নিগড়। অরুণবাবু প্রায় অনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জগন্নাথ, আশ-পাশের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই জীবন ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হবে, কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন হয়ত কিংবা বিরক্তও, কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবেই।

নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় উপ-স্থাপনার অভিনবত্বে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। নাটকের এমন ফিল্মিক ট্রিটমেন্ট সম্ভবত বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। দু-ঘন্টার নাটকে তিনি চিত্রনাট্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সর্বত্র। এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি নাটক বাঁধা ফ্রেমের বাইরে।

নাটকের শুরু মঞ্চের দুই প্রান্তে বিপ্লবীদের জমায়েত আর জগন্নাথের মৃত আত্মাকে নিয়ে। বরুণের কথায় বিদ্রূপ করে জগন্নাথ যখন বলে—'চুপ্ চুপ্', আমরা এখন মৃত জগন্নাথের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি' তখনই আসনে সোজা হয়ে বসতে হয়, চোখ ঘুরতে থাকে মঞ্চের আনাচে কানাচে। টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা মঞ্চ কখনও হয় দাসবাবুর বাড়ি—হেঁসেল, বিচারালয়, কালী মন্দির (হাঁড়ি কাঠ এবং বিচারকের চেয়ার একই রেখায় সংস্থাপন বিশেষ অর্থবহ বটে)। কখনও বা জগন্নাথের কুঁড়ে কিংবা রাস্তা।



জগন্নাথ/ স্বপ্না মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE YOJANA (Bengali) REGD. No. WB/CO-315
Price 50 Paise July 16—31, 1977

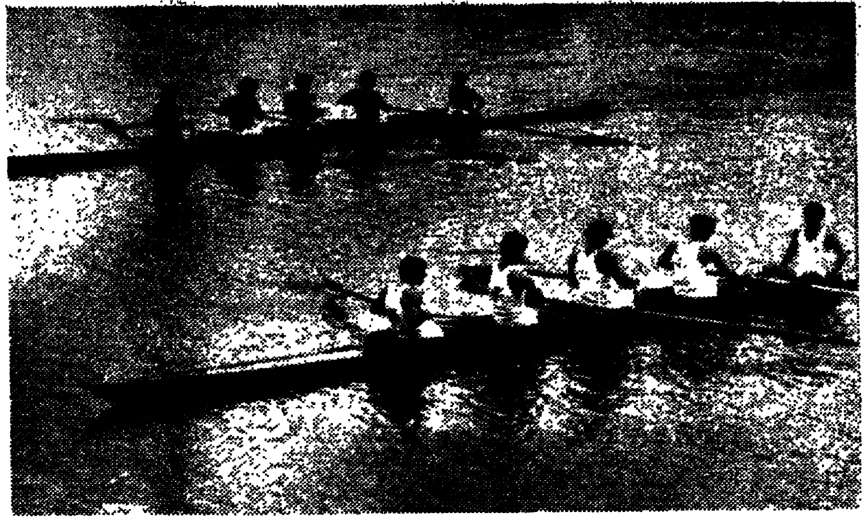
ছায়াছবির টাইটেল পর্বের মত টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যে শুরুতেই অরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দেন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে।

এরপর শুরু হয় নাটক।

ছেঁড়া ছেঁড়া সেই দৃশ্যগুলো বলে দেয় এই নাটক ব্যবসায়ে আপোষচরিত্রের নয়, কিংবা আপাত বামপন্থী বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা কিছু নেই। সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক জগন্নাথ। জগন্নাথ মাটির নাটক, মানুষ নিয়ে নাটক, জগন্নাথ মাটির মানুষের নাটক।

অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়কেও টপ্‌কে গেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দর্শকের একবারে বুকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও নীরব থেকে, কখনও মাইম্ করে তিনি সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন যেন সবার অজান্তে। দলগত অভিনয়েও কেউ কাউকে টেক্কা দিতে পারেননি, সবাই-ই সমান। মনোরমার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রকে একটু বেশী ভালো লাগার কারণ তার আবেগমণ্ডিত মুখশ্রী, কিংবা গাঙ্গুলীবাবুর চরিত্রের শিল্পীকে কিঞ্চিৎ 'নাটুকে' দোষদুষ্ট মনে হবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনায়, মঞ্চ, আলো, অভিনয় ইত্যাদির মোড়কে গভীর তত্ত্ব ও জীবনের যে সত্যটি নিয়ে 'জগন্নাথ' কলকাতায় হাজির তা শুধু নাট্যকার-নির্দেশকের নয়, দলের (চেতনা) মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং চেতনা বাংলা নাট্যজগতে চলে আসবে প্রথম সারিতে। এ সম্মান অবশ্যই তাঁরা দাবী করতে পারেন।

নির্মল ধর



নৌ-বাইচ ফাইনালে জুনিয়ার চার দাঁড়িতে বাংলা তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে

খেলাধূলা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিন্তা করা যায় নি, কলকাতার বুকে প্রথম জাতীয় নৌ বাইচের একটা জম-জমাট আসর বসতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই প্রতিযোগীতাকে ঘিরে এত উন্মাদনা থাকতে পারে। নৌ-বাইচের জাতীয় আসরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা দল। প্রতিযোগিদের সংখ্যা তেমন বড়সড় ছিল না; তবুও [illegible] প্রদেশ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে কয়েকটি বিভাগে। মোট ছয়টি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় মুখ্যত প্রাধান্য ছিল বাংলার জুনিয়ারদের; ফাইনালে পাঁচটিতেই বিজয়ী হয়েছে বাংলার খেলোয়াড়েরা। বাকিটাতে জিতেছে তামিলনাড়ু।

বাংলার সাফল্য এসেছে মুক্ত বিভাগের একদাঁড়ী (স্কাল), মুক্ত ও জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ী (পেয়ারস্থ) এবং চার দাঁড়ীর এক হালির (ফোরাস) ফাইনালে।

তামিলনাড়ু বিজয়ী হয়েছে জুনিয়ার বিভাগের একদাঁড়ীর ফাইনালে।

জাতীয় নৌ-বাইচে বাংলার সাফল্য

২৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র সরোবর লেক ক্লাবের সীমানায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি ছিল জুনিয়ার বিভাগের চার দাঁড়ী এক হালির ফাইনালে। শুরু থেকেই বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। সমাপ্তি রেখার বরাবর এসে বাংলা আধ নৌকার ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে তফাৎ-এ ফেলে দেয়। তারা তিন মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এটিই ফাইনালের সবচেয়ে আর্কষণীয় মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে দর্শকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ। দর্শকের ভীড়ও ছিল যথেষ্ট। বাংলা দলে ছিলেন এ রায়, এস [illegible], আর মুখার্জী, পি সাহা এবং হালি সি ব্যানার্জী।

প্রতিযোগিতার একমাত্র ট্রফি প্রেসিডেন্ট কাপকে ঘিরে মুক্ত বিভাগের চারদাঁড়ীর ফাইনালে বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। চার দাঁড়ীতে বাংলার পক্ষে ছিলেন সতীনাথ মুখার্জী, অশোক মেহতা কমল দত্ত, গিরিশ ফানিস এবং হালি নির্মল মজুমদার। জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ীর ফাইনালে বাংলার এস আর কালিদাস, তামিলনাড়ুর ম্যানিকমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জুনিয়ারদের দু দাঁড়ীতে বাংলা (কালিদাস ও এম আর উদয়শংকর) সহজে উত্তর প্রদেশকে এবং মুক্ত বিভাগে ঐ একই আসরে বাংলা (কমল দাস, অশোক মেহতা) দেড় নৌকার ব্যবধানে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে হারানোর সময় যে দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি করেছিল. দর্শকেরা তার মধুর স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। মুক্ত বিভাগে এক দাঁড়ির সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর এম এম সান্যালের কাছে মহারাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় আর দেশপাণ্ডের পরাজয় এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম অঘটন। কারণ, দেশপাণ্ডে গতবছর কলকাতায় আয়োজিত প্রাচ্য নৌ-বাইচের ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কলকাতার মানুষের কাছে এবং কয়েকটি বিভাগের স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত।

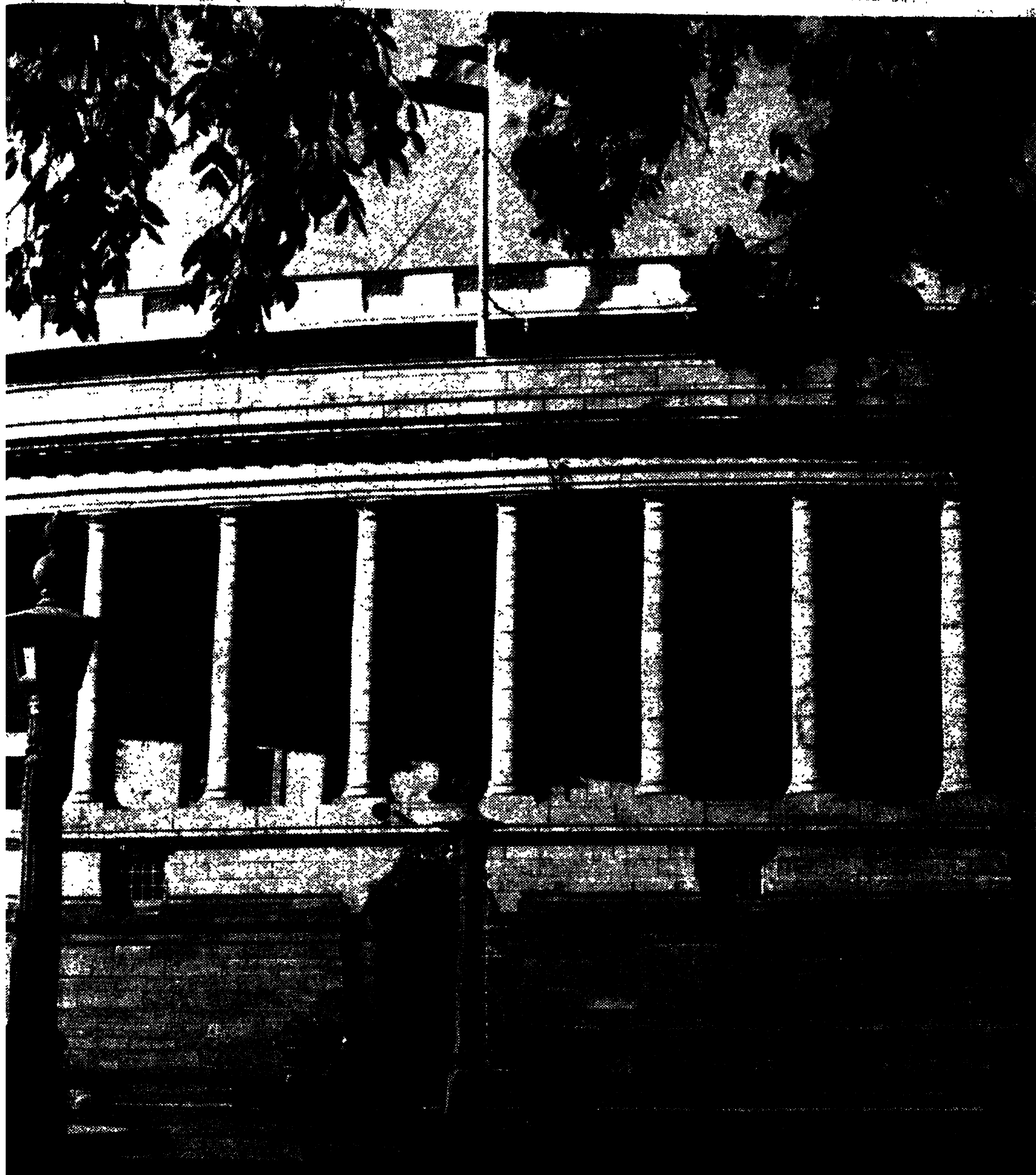
সরোজ চক্রবর্তী

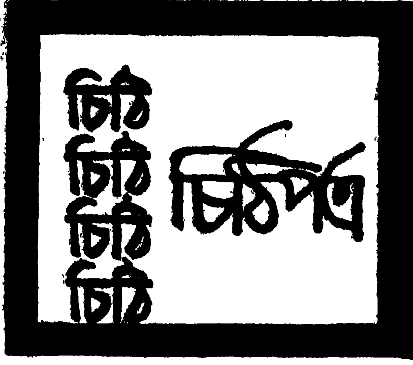
কেন্দ্রীয় তথ্য ও [illegible] প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
[illegible] প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

স্বাধীনতাদিবস সংখ্যা

এক টাকা





চলার পথে বহু জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। কোনটা নজর কাড়ে আবার কোনটা কাড়ে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা চোখ ঝলসানো জিনিসগুলোর দিকেই তারিফ করে চেয়ে দেখি। মন ভরুক কিংবা নাই ভরুক নামী জিনিসতো দামী হবেই—এই ভাবটা আমাদের মাঝে বড্ড বেশী কাজ করে। আমি এই দল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দিই কি করে? তাই বাংলা সাহিত্যের বাজারে চটকদারী (বাজারে যাদের জোর নামডাক) পত্র পত্রিকাগুলোর প্রতি বরাবরই আমার একটু আকর্ষণ। যেগুলো হালফিল এদের এড়িয়ে চলার একটা মানসিক অবস্থাও দিনে দিনে তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। অবসর সময়ে কাছে পড়ে থাকা ও (?) গুলোর পাতা উল্টোনোটাকে অকারণে সময় ব্যয় বলেই ভাবতাম। ঐ শেষোক্ত দলে 'ধনধান্যে'ও বাদ পড়েনি। কোন কোন জায়গায় যদিও নজরে এসেছে, কিন্তু ভেতরে কি মসলা আছে চোখে দেখিনি।

হঠাৎ ১৬-৩০ এপ্রিল ১৯৭৭-এ উল্টেথাকা পাতাটা চোখে পড়লো। মোহাম্মদ কারো মহাশয়ের চিঠিটাতে অকারণে চোখটা এগিয়ে গেল। চিঠিটা শেষ করে জানতে ইচ্ছা করলো ভদ্রলোক কথাগুলো সত্যি বললেন না কোন কারণে স্তুতি করলেন। তারপর সম্পাদকের কলমের কাছ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত একের পর এক লেখাগুলো পড়ে গেলাম। আশ্চর্য লাগল, অনেক নামীদামী পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে কোন টপিক্স বিরক্তি এনে দেয়; কিন্তু 'ধনধান্যে' বিদগ্ধ মনের রস শুধু মেটায়নি, বিষয় বৈচিত্র্যেও সুন্দর। বাংলা সাহিত্যের তারুণ্যের জোয়ার নিশ্চয়ই একে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবে। তবে এই পত্রিকাটিতে বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক সম্পর্কে নির্ভীক চিন্তাশীল আলোচনা থাকলে সাহিত্যে চেতনাবোধ আরও সুদূর প্রয়াসী হবে আমার ধারণা।

ভাগধর বারিক
সাগর, ২৪ পরগণা

হঠাৎ আপনাদের বিশেষ সংখ্যা 'সাহিত্য সংখ্যা ১৯৭৭' পড়লাম। সংখ্যা যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা বিরল। রচনার বিন্যাস সেই সঙ্গে প্রতিটি প্রবন্ধ, গল্পের সঙ্গে যে শক্তিশালী চিত্রকর্ম স্থান লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। সজ্জা-অলঙ্করণ, বলা বাহুল্য, যে কোনো বিখ্যাত পত্রিকা থেকে উৎকৃষ্ট। পত্রিকাটি আমার মনে এমন স্থায়ী ছাপ রেখেছে যে সেজন্য আপনাদের চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। অত্যন্ত রুচিশোভন অর্থব্যঞ্জক। এজন্য শিল্পী মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ধন্যবাদার্হ। আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সোমনাথ সামন্ত
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার:

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আগামী সংখ্যায়

সুজনের আকাশ (গল্প)
তেজেশ অধিকারী

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি
স্বপনকুমার ঘোষ

নিবন্ধ

পশ্চিম বাংলায় সীসা-দস্তা-রূপা
সঙ্কর্ষণ রায়

অ্যাবসার্ড নাটকের দুই শিল্পী
বিজয় দেব

আদিবাসীদের গানে চাষ
সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশেষ রচনা

এই লভিমু সঙ্গতব
কিষণচাঁদ বর্মণ

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন: ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী



**উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক**

১-৩১ আগষ্ট, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ চিত্র—পি. কে. কাপুর

সম্পাদকের কলমে

ত্রিশ বছর আগে এমনি এক পনেরই আগষ্ট আমরা পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। নিজের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব দেশবাসীর কাঁধে সেদিন ন্যস্ত হয়েছিল। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতবাসী সেই দায়িত্ব পালনে যে উত্তীর্ণ হয়েছে সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। গণতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি সেদিনকার দেশনেতারা দিয়েছিলেন, ভারতের নাগরিক সে প্রতিশ্রুতির অমর্যাদা করেনি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে যখন একে একে গণতন্ত্রের অকাল মৃত্যু ঘটেছে একনায়কতন্ত্রের হাতে, তখন ভারতবর্ষে সে হাওয়া কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি। ১৯৫০ সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল সেই সংবিধানের নির্দেশিত পথে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, ১৯৫২ সালে অর্থাৎ পঁচিশ বছর আগে স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের আরম্ভ প্রথম সার্বিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বহু পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ভারতের মত বিরাট দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার খুবই নগণ্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ছ-ছ'বার সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু ভারতবাসী প্রমাণ করেছে সেই সন্দেহ অমূলক। নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান, নানা কৃষ্টি, নানা সামাজিক আচার ও কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী প্রতিটি নির্বাচন-পরীক্ষায় সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অবলুপ্তির পর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে। ভারত কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সেই পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে।

গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতবাসী অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সেই অহিংস পথেই আবার পরিবর্তন সম্ভব সেই নীতিতে ভারতবাসী বিশ্বাসী। তাই গত সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে সুদীর্ঘ ত্রিশবছরের কংগ্রেস সরকার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শাসন ক্ষমতা থেকে কংগ্রেস দল অপসারিত। নতুন দল—জনতা জনসমর্থনে দেশ গঠনের দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

এই যে পরিবর্তন—এটা কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আসেনি, এসেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর এই যে আস্থা সেটাই প্রমাণ করেছে ভারতে স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ভারতবাসীর কাছে গণতন্ত্রই জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পথ। তাই শতশহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতাকেই শুধু নয় সেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার শপথ নেওয়ার দিন আজ। এই পুণ্যতিথি সেই শপথ গ্রহণের দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হোক। তাহলেই সার্থক হবে আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন।

স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা—এই তিন নিয়ে ভারতের সংসদ। যে কোন আইনের প্রস্তাব (বিল) লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করলে তবেই তা আইনে পরিণত হয়। এই ব্যাপারে উক্ত তিন প্রতিষ্ঠানকে সমক্ষমতাসম্পন্নই বলা যায়। কারণ কোন বিল শুধু লোকসভায় বা রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, আবার উভয় সভার অনুমোদনও একটি বিলকে আইনে পরিণত করতে পারেনা যদি না রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর না দেন।

রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা নির্বাচিত, যদিও সকলের নির্বাচন পদ্ধতি সমরূপ নয় (উভয় সভাতেই অল্প কয়েকজন মনোনীত সদস্য আছেন, যাদের কথা পরে বলা হবে)। সুতরাং বিলকে আইনে পরিণত করার পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক আদর্শ কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করা হয়নি আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায়। বৃটেনে রাজা অথবা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রপ্রধানপদে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত হন। বৃটেনের পার্লামেন্টের উচ্চসভা 'হাউস অফ লর্ডস্'-এর সকল সদস্যও হয় মনোনীত নয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ পদ প্রাপ্ত। সুতরাং বৃটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় হলেও তাকে সম্পূর্ণরূপে সংসদীয় গণতন্ত্র বলা যায় না। ভারতের সংবিধানে বৃটেনের প্রভাব থাকলেও এইখানেই দুই সংবিধানের মৌল পার্থক্য।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী এবং সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সাধারণ নির্বাচনে প্রথম গঠিত হয় কেন্দ্রের লোকসভা ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধান সভা। তারপর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের ভোটে গঠিত হয় রাজ্যসভা। রাজ্যসভার প্রথম বৈঠক বসে ১৯৫২ সালের ১৩ মে। সুতরাং, তারিখের হিসাবে, লোকসভার কয়েক মাস পরে গঠিত হয় রাজ্যসভা। এই কারণে সম্প্রতি যখন রাজ্যসভার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশে রজতজয়ন্তী পালন করা হয় তখন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে যে, শুধু রাজ্যসভার রজত জয়ন্তী হ'ল কেন? লোকসভার বয়স ত আরও বেশি, এবং তা অধিক প্রতিনিধিমূলক ও অধিক ক্ষমতাশালী। এর প্রধান কারণ দুটি।

প্রথমত, লোকসভা প্রাক-স্বাধীন যুগের বিধিব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। বৃটেনের ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ মে তারিখে ঘোষিত পরিকল্পনা অনুসারে ঐ বছর ৯ ডিসেম্বর যে পরিবর্ধিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়, তাই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) ও কেন্দ্রীয় সংসদরূপে কাজ করতে থাকে। সংবিধান রচনার কাজ শেষ হ'লে কেন্দ্রীয় সংসদ আর গণ-পরিষদ থাকেনা, কিন্তু ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন লোকসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল দায়িত্ব বহন করতে হয়। সুতরাং প্রথম লোকসভাকে প্রাক-স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিসভার অবিচ্ছিন্ন ধারা বলা যায়। সেই হিসাবে লোকসভার সঠিক বয়স নিরূপণ সহজ নয়।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা যেমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান লোকসভা তা নয়। সাধারণ অবস্থায় লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তার আগেও লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। যেমন, ১৯৬৭ সালে গঠিত লোকসভা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার দেশে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তাহলে লোকসভার মেয়াদ পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তার আয়ু প্রতিক্ষেপে একবছর করে বাড়িয়ে যাওয়া চলে, যেমন বাড়ানো হয়েছিল ১৯৭৬ সালে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার কালে।

লোকসভা ভেঙে দিলেই তার সকল সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এবং সে নির্বাচনে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া লোকসভার সদস্যরা বড় জোর নিজেদের প্রাক্তন সংসদ-সদস্য বলতে পারেন। অপরদিকে রাজ্যসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তার একজন সদস্য অবিচ্ছিন্নভাবে বারবার নির্বাচিত হতে পারেন। যেমন শ্রী ভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার সদস্য আছেন, একদিনের জন্যও তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়নি। তাঁর ছয় বছর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

লোকসভাতেও শ্রীজগজীবন রাম, শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁরা লোকসভার সকল নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তার সদস্য আছেন। কিন্তু লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সদস্য পদেও ছেদ পড়েছে। বর্তমানে তাঁরা ষষ্ঠ লোকসভার সদস্য।

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, বর্তমান সংবিধানে এমন কোন বিধি নেই যা প্রয়োগ করে রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকাল ছয় বছর, এবং ঠিক দুই বছর অন্তর তাঁদের এক-তৃতীয়াংশের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। তখন যে রাজ্যের যে ক'জন সদস্যের কার্যকাল শেষ হয় সেই রাজ্যের বিধান সভার সদস্যরা ভোট দিয়ে সেই ক'টি শূন্যপদ পূরণ করেন। ভোট হয় একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের রীতি অনুসারে। এই ব্যবস্থা থাকার জন্য বিধানসভার সংখ্যালঘু দলগুলিও প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থার জন্যই, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টি কোনদিন গরিষ্ঠ দল না হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে শ্রী ভূপেশ গুপ্ত বারবার নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভার প্রবীণতম সদস্য হতে পেরেছেন।

রাজ্যসভার সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত। সুতরাং তাঁদের নির্বাচন পরোক্ষ, লোকসভার সদস্যদের মতো তাঁরা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হন না। ফলে স্বভাবতই রাজ্যসভার সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের জোর অনেক কম। সংবিধানেও লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভার ক্ষমতা সীমিত, লোকসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাংবিধানিক জোর রাজ্যসভার নেই। রাজ্যসভা হয়ত লোকসভায় অনুমোদিত কোন বিল না-মঞ্জুর ক'রে সাময়িকভাবে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু দুই সভার যুক্ত অধিবেশন বসলে রাজ্যসভার নতি স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কারণ লোকসভার সদস্য-সংখ্যা রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশি।

তাই লোকসভায় অনুমোদিত বিল রাজ্যসভায় আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর গৃহীতই হয়ে থাকে। তাছাড়া দলীয় রাজনীতির জন্য লোকসভায় যে দলের প্রাধান্য রাজ্যসভাতেও সাধারণ অবস্থায় সেই দলেই প্রাধান্য থাকে। আর দলের হুইপ সকল সদস্যের অবশ্য গ্রাহ্য বলে লোকসভায় অনুমোদিত বিল রাজ্যসভার অননুমোদিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকেনা। কিন্তু কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে যদি লোকসভায় একদলের ও রাজ্যসভায় অন্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটে এবং সেই সুযোগ নিয়ে রাজ্যসভা যদি লোকসভার বিল নামঞ্জুর করতে শুরু করে তাহলে সাংবিধানিক সঙ্কট অপরিহার্য হয়। বর্তমানে লোকসভায় জনতা দলের



ও রাজ্যসভায় কংগেসের গরিষ্ঠতা। এখন এই দুই দল যদি একমত হয়ে চলতে না পারে তবে দুই সভার পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে সংসদের কাজ চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই জন্য বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলেন, সাধারণ অবস্থায় যে সভার সমর্থন বাহুল্য মাত্র এবং অসাধারণ অবস্থায় যার বিরোধিতা বিপজ্জনক, তাকে রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থব্যয় ক'রে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন কি?

কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব, আচরণ, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজ্যসভার অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন পর্যন্ত হতে পারে, বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৪৩। তাঁদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতির মনোনীত। সংবিধানে ব্যবস্থা আছে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি অথবা সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত সুধীজন যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননা, অথচ দেশ গড়ার কাজে যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, রাষ্ট্রপতি তাঁদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক বারো-জনকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করতে পারেন। তাঁদের কার্যকালও ছয় বছর, এবং একজনের কার্যকাল শেষ হলে ঐ শূণ্যপদে রাষ্ট্রপতি আর এক জনকে মনোনীত করেন। এই ভাবে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন অধ্যাপক সত্যেন বসু, এম. সি. শীতলাবাদ, সি. কে. দফতরি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সর্দার কে. এম. পানিকার, ডঃ তারাচাঁদ, পৃথ্বিরাজ কাপুর প্রমুখ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক বিশিষ্ট জনেরা। তাছাড়া আচার্য নরেন্দ্র দেও, ভূপেশ গুপ্ত, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, জয়াভাই প্যাটেল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারাও বিভিন্ন সময়ে রাজ্যসভার সদস্যরূপে তাঁদের ভাষণ ও আচরণ দিয়ে শুধু রাজ্য সভার মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন-নি, তার অস্তিত্বের অপরিহার্যতা সম্পর্কেও সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করেছেন।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি। সেই কারণে রাজ্যসভা তার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশ বছর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতো সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও মহৎপ্রাণ মণীষীর হাতে লালিত ও পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তারপর ঐ আসন অলংকৃত করেছেন ডঃ জাকির হোসেনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিত এবং ভি. ভি. গিরি, জি. এস. পাঠক, বি. ডি. জাত্তি প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। এঁদের জন্যই রাজ্যসভার বিতর্কের মান কোনদিন নত হয়নি, সদস্যদের চিৎকারে ও হুল্লোড়ে মেছো হাটায় পরিণত হয়নি। রাজ্যসভা যখন

কোন বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছে তখন লোকসভার পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যসভার যে অগণিত আলোচনা সংসদে তথা সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এই নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কয়েকটির উল্লেখ না করলে রাজ্যসভার সম্যক পরিচয় মিলবে না। শ্রী চন্দ্রশেখর প্রমুখ কয়েকজন সদস্য রাজ্যসভাতেই প্রথম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি ফাঁস করেন এবং তাঁদের দাবির চাপে ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কমিশন গঠিত হয়। শ্রী দয়াভাই প্যাটেল রাজ্যসভাতেই জয়ন্তী শিপিং কোম্পানির অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ প্রথম প্রকাশ করেন। আমদানি লাইসেন্স কেলেঙ্কারি, যা তুলমোহন রাম মামলা নামে বেশি পরিচিত, তাও প্রথম ফাঁস হয় রাজ্যসভায়, শ্রী কৃষ্ণকান্তের জবানিতে। রাজন্যভাতা বিলোপের দাবিও প্রথমে রাজ্যসভাতেই ওঠে, সে দাবি তোলেন শ্রী বি. বি. দাস। আবার রাজনৈতিক ঘটনার অদ্ভুত গতি পরিবর্তনের ফলে, রাজন্যভাতা বিলোপ বিলটি লোকসভায় অনুমোদন লাভের পর রাজ্যসভায় মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সারা দেশে একটা রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটে যায়। হিন্দু কোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিলের দফাওয়ারি আলোচনা রাজ্যসভায় প্রথম শুরু হয় এবং রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর তা লোকসভায় যায়। যৌতুক বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে রাজ্যসভা ভিন্নমত পোষণ করায় ১৯৬১ সালের ২০ মে সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন বসিয়ে তার মীমাংসা করা হয়।

লোকসভার গুরুত্ব তর্কাতিত। ঐ সভার সদস্যরা দেশের সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত এবং বিগত পঁচিশ বছরে জওহরলাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, আসফ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালনী, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া, ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, কে. কামরাজের মতো দেশনেতারা লোকসভার সদস্য হয়ে দেশের শাসন দায়িত্ব নির্বাহে অংশ নিয়েছেন। ফিরোজ গান্ধী, আনসার আরবানি, নাথ পাইর মতো নবীন সদস্যরা সংসদে প্রথম আবির্ভাবেই দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানের স্বীকৃতি আদায় করেছেন। নেহরু-শ্যামাপ্রসাদ তর্কযুদ্ধও ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।



গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটদাতারা ভোটপ্রদানের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষমান

এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধিতায় নয়, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় সংসদের উভয় সভার স্বকীয়তা ও সার্থকতা। যে অগণিত বিলের বিচার বিশ্লেষণ ও অনুমোদন সংসদকে করতে হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সময় তার নেই। সুতরাং সব বিল প্রথমে লোকসভায় তুলে ও তাড়াহুড়ো করে পাশ করিয়ে রাজ্যসভায় শুধু অনুমোদনের জন্য না পাঠিয়ে যদি অর্থ বিল বাদে অন্য বিলগুলি আগে রাজ্যসভায় বিশদভাবে আলোচনা করে পরে লোকসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় তা হলে প্রতিটি বিলের কথাই দেশের লোক ভালমতো জানার সুযোগ পায়। এতে কোন বিলের প্রতি অবিচার হওয়ারও আশঙ্কা নেই। কারণ উভয় সভাতেই সবকটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আছেন। রাজ্যসভার কম্যুনিষ্ট সদস্য একটি বিল সম্পর্কে এমন কোন কথা বলবেন না, যা লোকসভার কম্যুনিষ্ট সদস্যদের গ্রহণযোগ্য নয় বা কোন কংগ্রেসী বা জনতা সদস্য প্রস্তাবিত বিলটির উপর এমন কোন সংশোধনী আনবেন না লোকসভায় সেই দলের সদস্যরা যার বিরোধিতা করবেন। আসল কথা হল, রাজ্যসভার উপর আরও বেশি কাজ চাপিয়ে তাকে অধিক দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র দুই অশ্ব-চালিত রথের মতো, যার সুষ্ঠু ও সাবলীল অগ্রগতির জন্য চাই লোকসভা ও রাজ্যসভার সম মর্যাদা ও সমান গতিশীলতা।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচন

নির্মল বসু

গণপরিষদ ভারতের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করে তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। গণপরিষদের সদস্যগণ বিশ্বে প্রচলিত সকল প্রকার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতের জন্য সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল। ভারতে দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসন ও এই শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রিটেনে জন্মলাভ করা এই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি, এটা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদারতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, স্বাধীন সংবাদপত্র, সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইনসভার নির্বাচন। আইনসভার অস্তিত্ব এবং এই আইনসভার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এককালে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ছিল—স্পার্টা এথেন্সে সকল নাগরিক একত্র মিলিত হয়ে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে প্রতিনিধি-গণতন্ত্র। জনসাধারণের পক্ষে এখন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজ করেন—আইন প্রণয়ন করেন, শাসন পরিচালনা করেন, এমনকি বিচারের কাজ কিভাবে চলবে তারও নীতি তারাই স্থির করে দেন। এই অবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয় না এবং গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়। শাসনের ওপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। সরকারী কাজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

ভিন্নমত পোষণের অধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। যারা শাসনে কর্তৃত্ব করছেন অর্থাৎ সরকারী দল, কিংবা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা কর্তাব্যক্তি হয়ে বসে আছেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে যে মত পোষণ করেন যদি সবাইকে তা নির্বিচারে মেনে নিতে হয় তবে তার নাম হয় একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রে ভিন্নমত পোষণ ও তার পক্ষে প্রচারের পূর্ণ সুযোগ থাকে। রাজনীতিক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও কর্মপন্থার সমালোচনা করা, তার বিরোধিতা করা, প্রতিরোধ করা এবং পাল্টা বক্তব্য রাখার অধিকার নাগরিকমাত্রেরই থাকে। ভিন্ন, বিকল্প, বিপরীত কর্মসূচী নিয়ে জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং এই কর্মসূচীর সমর্থকদের পক্ষে সরকার গঠন করে তার সার্থক রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ। আর এই কাজ করতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে।

সংবিধান অনুযায়ী ভারতে কেন্দ্রীয় সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিধানসভা ও কয়েকটি রাজ্যের বিধান পরিষদের নির্বাচন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। তারপর বারে বারে নির্বাচন হয়েছে। সংবিধাননির্দিষ্ট সময় ছাড়াও অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ১৯৫২ সালে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা হল নানাদিক থেকে তা পূর্বেকার নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। পূর্বে নিয়ন্ত্রিত ভোটব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক ভোটদানের অধিকারী ছিল—যারা কিছুটা শিক্ষিত ও যাদের কিছু আর্থিক যোগ্যতা ছিল কেবল তারাই ভোট দিতে পারত, আর এখন ২১ বৎসর বয়স হলেই স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই ভোট দিতে পারে। ভোটাধিকার সর্বজনীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে ভারতের মুসলমান, শিখ, অ-মুসলমান, এইভাবে ভোটদাতারা বিভক্ত হয়ে ভোট দিত। এখন ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক। ধর্মের ভিত্তিতে ভোট দাতাদের মধ্যে কিংবা আইনসভায় আসন-বণ্টনের ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য করা হয় না। ধর্মনির্বিশেষে সকলে সমানভাবে ভোটদানের অধিকারী, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। তপশীলী জাতি ও উপজাতির লোকেদের জন্য বর্তমানে লোকসভা ও বিধানসভায় সাময়িকভাবে যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে করা হয়নি, এর ভিত্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

সংবিধান প্রণয়নের সময় যখন ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয় তখন অনেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, ভারতের মত দেশে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশের ওপর মানুষ নিরক্ষর সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকে ভোটের অধিকার দিলে নির্বাচন যথার্থ হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের ভোটে অনুপযুক্ত লোকেরা নির্বাচিত হবে এবং এদের

দ্বারা গঠিত অযোগ্য সরকারের শাসনে দেশের সর্বনাশ হবে। এই তর্ক অবশ্য নতুন নয়। অনেক আগে থেকেই দেশে ও বিদেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে বিপক্ষে জোর আলোচনা চলছে। এই সব সমালোচনা অগ্রাহ্য করে দেশের নেতৃবৃন্দ 'অশিক্ষিতের দেশ' ভারতে সকলের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীকালে, অনেকগুলি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরেও, দেশী বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমাজের জাতিভেদ প্রথা, সাধারণ মানুষের রক্ষণশীলতা, মেয়েদের অনগ্রসরতা প্রভৃতি কারণে এদেশে নির্বাচন ব্যর্থ হচ্ছে। নির্বাচনকালে ভোটদাতাদের প্রদত্ত রায় বলে যা ঘোষিত হয় প্রকৃতপক্ষে তা জনসাধারণের সচেতন, স্বাধীন, নিজস্ব মত নয়।

এই সমালোচনার মধ্যে অবশ্যই কিছুটা সত্যতা আছে। তথাপি ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং নির্বাচন সফল হয়েছে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতে নির্বাচনের পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের সাধারণ ভোটদাতাগণ মত দানকালে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচনের একটা বড় কথা পরিবর্তন। যাকে পছন্দ নয়, যার রাজনীতি পছন্দ নয় তাকে ভোটদাতারা চাইলে পরিবর্তন করতে পারবে। এই জিনিষ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, বিধানসভা বা লোকসভার যে সদস্য আগের থেকে রয়েছেন তিনি হয়তো নানাবিচারে শক্তিশালী তিনি হয়তো মন্ত্রী কিংবা বিশেষ অর্থশালী কোন ব্যক্তি কিংবা বিশেষ ধর্মগুরু, কিন্তু নির্বাচনের ফলে দেখা গেল তিনি পরাজিত হয়েছেন। ভোটদাতারা তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছে। রাজনৈতিক দল ও সরকারের



সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

সম্পর্কেও একই ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত একটানা সরকার পরিচালনা করেছে। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল, কংগ্রেস হেরে গেছে। কংগ্রেস দল ভাবতে পারে নি যে তারা হারবে। বিরোধী দলগুলিও আশা করতে পারে নি যে কংগ্রেস এই নির্বাচনে পরাজিত হবে এবং তাদের সরকার গঠন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ভোটদাতারা নীরবে তাদের রায় দিয়েছে—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বিরোধী দলগুলির পক্ষে। তারা শাসনের পরিবর্তন চেয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট এমনকি বিহার উত্তর প্রদেশে, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যেও বারে বারে এই জিনিষ ঘটেছে। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলও এই একই কথা প্রমাণ করে। কেন্দ্রে দীর্ঘ ৩০ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের পর এবার সেখানে অকংগ্রেসী শাসন—জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধি-গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা আইনসভা সদস্যের সঙ্গে তাঁর ভোটদাতাদের বা ব্যাপক অর্থে নির্বাচনক্ষেত্রের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। কারণ, গণতন্ত্রে জনসাধারণই দেশ শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই প্রতিনিধিরা যদি জনসাধারণের সঙ্গে যোগ না রাখেন বা তাদের আশা আকাংখা দাবী মতন কাজ না করেন তাহলে তা আর যাই হোক জনসাধারণের শাসন বা গণতন্ত্র হয় না। ভারতে এই ব্যবস্থা মোটামুটি গড়ে উঠেছে। কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, আইনসভা সদস্যরা তাদের নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। যাদের সঙ্গে নির্বাচনক্ষেত্রের যোগাযোগ ক্ষীণ তাদের পক্ষে পুনর্নির্বাচিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারী কাজের ব্যবস্থাও এমন যে স্থানীয় বিধানসভা ও লোকসভা সদস্যকে এখানকার নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত থাকতে হয়। তৃতীয়ত, বারে বারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই জিনিষ দেখা গেছে, যাদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ নেই, যারা দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য কোন কাজ

করেন নি, যাদের ব্যক্তিগত সততা সন্দেহের উর্দ্ধে নয় তাদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া শক্ত। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যোগ্য ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই সাধারণত নির্বাচিত হয়েছেন। চতুর্থত, দেশে এখনও জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদ প্রভৃতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সাধারণ ভোটদাতারা এই সব বিভেদের উর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক বিচারের দ্বারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই দেখা গেছে, নেপালী অধ্যুষিত এলাকা থেকে শক্তিশালী নেপালী প্রার্থীকে পরাজিত করে বাঙালী নির্বাচিত হয়েছেন। আবার এও দেখা গেছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় দলে দলে মেয়েরা নামকরা মহিলা হিন্দু প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অবাঙ্গালী মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন। জাতি ও ধর্মের হিসাবের উর্দ্ধে রাজনীতির বিচারে, অশিক্ষিত সাধারণ ভোটদাতারাও এই সত্য উপলব্ধি করেছে। সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখা গেছে।

ভারতের বিগত লোকসভা নির্বাচন এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। জরুরী অবস্থার অন্ধকারময় দিনগুলিতে অনেকের পক্ষেই ভাবা কঠিন হয়ে পড়েছিল যে এই দুর্দিনের অবসান ঘটবে, অন্তত এর আশু পরিবর্তন হবে। ইন্দিরা-শাসন চলবে এবং অন্তত বেশ কিছুকালের জন্য ভারতে স্বৈরশাসন অব্যাহত থাকবে, এটাই প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিল। এমনকি বিদেশে যারা ভারতে গণতন্ত্রনিধন-প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরাও প্রায় সবাই এমনটাই ভাবা সুরু করেছিলেন। কিন্তু মার্চ, ১৯৭৭-এর লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা গেল, সাধারণ ভোটদাতারা গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিয়েছে, একনায়কতন্ত্রের অবসানকে তারা সম্ভব করেছে। যে ইন্দিরা গান্ধী জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি রায়বেরিলিতে পরাজিত হয়েছেন, তিরিশ বছর একটানা শাসনের পর কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে এবং উত্তর ভারত থেকে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এতটা কেউ-ই ভাবতে পারে নি—বিরোধী পক্ষও নয়। মূক, দরিদ্র ভারতবাসী নীরবে তাদের রায় দান করেছে। এই ব্যাপারে ভারতের ভোটদাতা তথা জনসাধারণ যে অসাধারণ গণতন্ত্রবোধ ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। যথার্থভাবেই তাই অনেকে একে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি যে কত দৃঢ় হয়েছে এবারের লোকসভা নির্বাচন থেকে তা বোঝা গেল। কোন দল যত ঐতিহ্যপূর্ণ শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন ব্যক্তি যত জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হোন না কেন, তাঁরা যদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যান স্বৈরতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন তবে জনসাধারণ

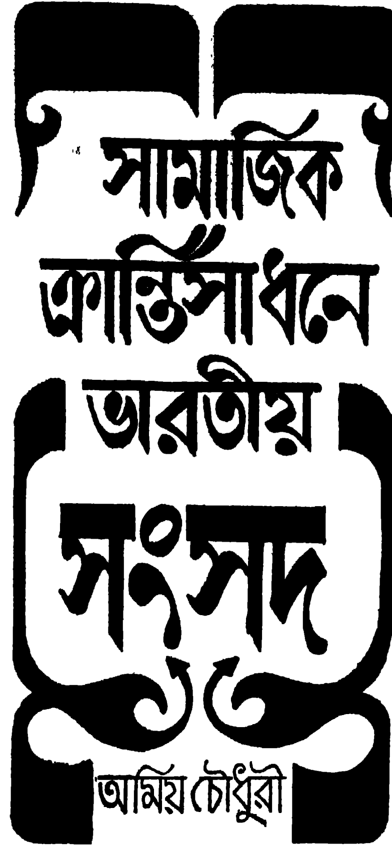


তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না—। সুযোগ পেলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা জবাব দেবে। এই নির্বাচনে সেই জবাবই তারা দিয়েছে। জুন মাসের বিধানসভা নির্বাচনেও এই কথাই প্রমাণ হল। সব রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হল। কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়লাভ করল, অথচ পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির চরম বিপর্যয় হল, এখানে বামপন্থীরা বিপুলভাবে জয়ী হল। সাধারণ ভোটদাতারা নিজেদের বিচারমত এখানে কাজ করেছে।

সাতাত্তরের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন দেশবাসীর মনে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি নতুন করে আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। গণতান্ত্রিক পথে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়, নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করা যায়, এই বিশ্বাস তাদের হয়েছে। বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো যতদিন থাকবে ততদিন এই গণতন্ত্রও থাকবে। সেদিক থেকে সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল গণতন্ত্রকে নিরাপদ করেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, স্বাধীন সংবাদপত্র, সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইনসভার নির্বাচন।

তবে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য যদি না কমে তবে নির্বাচনে ধনীদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ শেষ হবে না। তাই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমস্যা দ্বিতীয়ত, যে দলই সরকার গঠন করুন না কেন, যত জনপ্রিয় ব্যক্তিই সরকারের প্রধান হোন না কেন, জনসাধারণকে তাঁদের কাজের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ভাল কাজ করলে যেমন সমর্থন করতে হবে, তেমনি খারাপ কিছু করলে তার সমালোচনাও করতে হবে। মনে রাখতে হবে, "সদাসতর্ক মনোভাবই স্বাধীনতার মূল্য"।



ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে তৎকলীন ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে তখন একটি প্রশ্নই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কী করে বিদেশী শাসন এবং শোষণের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা যায়। বরং বলা যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ভারতের রাজনৈতিক মতাদর্শকে একমুখি করেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে নি। এই শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সেইমত ভারতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা তাই কোন পরস্পর বিরোধী মতের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হয় নি। ১৯৪৬ এর ডিসেম্বরে গণপরিষদ গড়ে উঠলো সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনা। এখানে কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যত রাজনৈতিক গঠন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ রইলো না। যদিও গণপরিষদের সদস্যগণ মার্ক্সবাদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করলো তা হলো সংসদীয় গণতন্ত্র। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক কাঠামোর বনিয়াদ স্থাপন এবং সামজিক জীবনের আধুনিকীকরণ।

১৯৫০ সালে সংবিধান গৃহীত হলো। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত গণপরিষদই অন্তর্বর্তীকালীন সংসদ হিসাবে কাজ করতে থাকলো। এই সময়ে বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উল্লেখ্য পরিবর্তনের পদক্ষেপ হয় নি বললেই চলে। সংবিধান অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক হাতিয়ার। কিন্তু এই রাজনৈতিক হাতিয়ার তখন অবধি সামাজিক সর্বজনীন স্বীকৃতি পায় নি। অন্তর্বর্তী সংসদও স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালীন ভাবনা চিন্তার দ্বারা শৃঙ্খলিত। সংসদ সদস্যগণ তৎকালের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিত প্রতিনিধি। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আবর্তে ঘটনার উত্থিত পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নতুন করে মূল্যায়ন এবং গণতান্ত্রিক মুক্ত রাজনৈতিক অবস্থায় উভয়ের সাযুজ্য স্থাপন আশু প্রয়োজন। অথচ এ কাজ সর্বজনীন অনুমোদন ছাড়া গণপরিষদের দ্বারা সম্ভব নয়। ভারতের গ্রামীণ আর্থনীতিক ভাবনায় সমাজ ব্যবস্থার যে প্রাচীন চেহারা, দীর্ঘদিনের বৃটিশ আধিপত্যেও তা' আধুনিকীকৃত হয়ে ওঠে নি। গণপরিষদের দস্যগণ—যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এটা বুঝেছিলেন যে আমাদের বদ্ধ সমাজব্যবস্থা রুগ্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় এক দুষ্ট চক্রে আবর্তিত। সমাজব্যবস্থায় জটিল শ্রেণীবিন্যাস। এবং স্তর বিন্যাসের এই প্রকৃতি অন্তর্মুখি। অতএব সমাজ পরিবর্তনের উপাদানগুলিও ওপরের স্তর-গুলিতে আবদ্ধ। উপাদানগুলি সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে সমাজ জীবনের আধুনিক ভাবনা চিন্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া দুরূহ। অথচ সমাজ পরিবর্তনে যে রাজনৈতিক উপাদানগুলোর প্রয়োজন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে তার অভাব ছিলো না। একটা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, সৌভাগ্যবশত: ভারতবর্ষে তা ছিলো। দ্বিতীয়ত বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করলো কিন্তু পিছনে রেখে গেলো তার বিরাট এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস দেখলে, সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। এগুলি স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার শুভ সংকেতই বলা চলে।

১৯৫২ সালে প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে তখনো 'সাক্ষর'-এর শতকরা হিসাব কিঞ্চিদধিক ১৬ জন। অথচ ১৭.৩ কোটি লোক ভোট প্রদানের দ্বারা ভারতের প্রথম নির্বাচনে সংসদ গঠন করে। পূর্বেই সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক রূপান্তর সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিন্যাসে সংবিধান ভবিষ্যত সমাজ জীবনে এক সুষম বিকাশ কল্পনা করলো। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সম্প্রদায়কে বিশেষ করে তপশিল ভুক্ত জাতি ও উপজাতির বিশেষ সুযোগ সুবিধাদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ও অর্থ-নৈতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে সামাজিক প্রগতির দিক নির্দেশ করেছে। হরিজন সম্প্রদায় এখন আর আইনত অচ্ছুত নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার গণ্ডী প্রশস্ততম করবার জন্য সব রকম সামাজিক অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংবিধানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ উন্নতিশীল দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে যে সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে জনগণকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করানো

সম্ভব ভারতবর্ষের সংবিধানে তা' প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এতো সব কাগজে কলমে। প্রায় রক্ষণশীল প্রাচীন এই দেশের অচলায়তন সমাজ জীবনে সংবিধানের বিধিগুলোকে বাস্তবায়ন তো এক দুরূহ ব্যাপার। শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা সেই নেতৃবর্গ তাঁদের আদর্শের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের আর্থনীতিক কার্যকারণ আবিষ্কার করতে পারেন, নীতি নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ না সমগ্র জন সমাজ সমাজ গঠনের কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারে ততক্ষণ সামাজিক প্রগতির লক্ষণ শুধু মহৎ লক্ষ্যমাত্র তত্ত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। সামাজিক ক্রান্তি সাধনে দায়িত্ব তাই সংসদেরই। জনগণই এই সংসদ গড়ে তোলে তাদের ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধিরা জনগণেরই সামাজিক অবস্থিতির প্রতিফলন। জনগণের আশাআকাঙ্খার ধ্বনি তাদের প্রতিনিধিদের কণ্ঠে সোচ্চার। ভারতীয় সংসদের বয়স পঁচিশ বছর। বিগত এই বছরগুলি সাধারণ নির্বাচনের সংখ্যা ৬ টি। ১৯৫২ সালে যেখানে ভোটার সংখ্যা ছিলো ১৭ কোটির কিছু বেশী, সেখানে ১৯৭৭ সালে ভোটারের সংখ্যা ৩৩ কোটির কিছু বেশী। স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছরে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ২০ কোটি কিন্তু ভোটারের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। অতএব রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী। অতএব এটা সামাজিক পরিবর্তনের পথের শুভ সূচনা। সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাঁরা স্বভাবতই সমাজ, জীবনের বহুমুখি সমস্যা, আশাআকাঙ্খা এবং সংসদের বাইরের নিত্য নূতন উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। তাঁদের দায়িত্ব সরকারের শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় নীতি কার্যকরী করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে—তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা যথাসম্ভব পালন করতে চেষ্টা করেছেন। সংসদ দুটি কক্ষে বিভক্ত, লোকসভা এবং রাজ্যসভা। জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু লোক সভার গুরুত্বই বেশী, অতএব সমাজ বিন্যাসের প্রকৃতি প্রতিফলন লোকসভাতেই হয়ে থাকে। এই সময়ে লোকসভার সদস্যগণের বয়সের গড় ৪৯.২ বছর। শিক্ষা: স্কুলের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-নন ২৩.১%। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—১৬%। স্নাতক: ৩৪.৬%। স্নাতকোত্তীর্ণ, কারিগরী সহ: ২৪.৭% এবং ডক্টোরেট: ১.৫%। জীবনের যে সব বৃত্তি থেকে যাঁরা এসেছেন তা হলো: (১) কৃষি এবং ভূমিদার—২০.৯%। (২) রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী—২৫.২%। (৩) আইনজীবী—২২.৬%। (৪) ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি—৯.২%। (৫) শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতী—৫.৯%। (৬) সাংবাদিক ও লেখক—.৬%। (৭) সিভিল সার্ভিস—৩.১%। (৮) সামরিক—০.৫%। (৯) ডাক্তার—৩%। (১০) ইন্‌জিনীয়ার এবং অন্যান্য—৬.%। (১১) প্রাক্তন রাজন্যবর্গ—২.১%। (১২) ধর্মীয় সংখ্যালঘু—.৩%। (১৩) শিল্প শ্রমিক—.১% এবং (১৪) শিল্পী—.১%। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই হিসাবের কিছু তারতম্য ঘটে। কৃষক এবং ভূমিদারগণের প্রতিনিধিত্ব বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.২%। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীর হিসাব কমে আসে ২৫.২% থেকে ১৯%; আইনজীবী ২০.৫%; ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি ৬.৮%; অন্যদিকে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ে ৫.৯% থেকে ৭.১%। এবং সিভিল সার্ভিসের প্রতিনিধিত্ব নেমে আসে ৩.১% থেকে ২.৬%। সামরিক বৃত্তি—.৫% থেকে .৪%। ডাক্তার ৩% থেকে ১.৭%। ইন্‌জিনীয়ার .৬% থেকে বেড়ে ১.২%। অপরদিকে প্রাক্তন রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্ব কমে দাঁড়ায় ২.১% থেকে .৪%। ধর্মীয় সংখ্যালঘু .৩% থেকে .৪% এবং বিশেষ করে শিল্প শ্রমিক এবং শিল্পীর প্রতিনিধিত্ব কমে দাঁড়ায় শূণ্যে।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান সমাজব্যবস্থা এবং তার শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তনের মন্থর সূচক। ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামকেন্দ্রিক। অথচ গ্রামীণ প্রতিনিধিত্ব শতকরা মাত্র ৩৩.২%। যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি কার্য কর করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হোত যেমন কৃষির উন্নতি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ধর্মীয় গোঁড়ামির অপসারণ এবং তারজন্য সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার, গত ত্রিশবছরে আমাদের দেশে তার সূচনাই হয়েছে, বিকাশ হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—সংসদীয় ব্যবস্থায় যে সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হয়, তাদের গতি, গণতান্ত্রিক প্রকৃতির কারণেই মন্থর। সংসদ কি করতে পারে? শাসন-বিভাগের নীতি নির্ধারণের সমালোচনা বা বিভিন্ন সরকারী কমিটি পর্যায়ে পরামর্শ-দানের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে কতটুকু। দীর্ঘ ২৫ বছরের ইতিহাসে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার গঠনগত দুর্বলতাও এর জন্য কতকটা দায়ী। একটা রাজনৈতিক দলই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শাসন ক্ষমতায় অবিচ্ছিন্নভাবে আসীন। অপর দিকে বিরোধী দলগুলো কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। এক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়েছে। সরকার জনকল্যাণের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করেছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে নি। রাজনীতি-পরিচালিত হয়েছে ক্ষমতার কেন্দ্রকে-পরিক্রমন করে, রাজনীতির সামাজিকীকরণ হয়ে ওঠে নি। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতাও এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও আর্থনীতিক চিন্তা ভাবনা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের চাপে ভারগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের দৈন্যদশা বেড়েছে বই কমেনি। জমিদারী

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন



সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে রাষ্ট্রকাঠামো গঠিত হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায় সে সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ এবং এদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সংসদীয় গণতন্ত্র লোকশাসন নয়। জনগণ ভোট দেয়, শাসন করে না। যারা জনসাধারণের ভোট পেয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হন তাঁদেরও অধিকাংশ শুধু বক্তা বা শ্রোতা, শাসনযন্ত্র তাদের হাতে নয়।

কেন এমন হয় তা বুঝতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ফেলে-আসা অধ্যায়ের দিকে তাকাতে হবে। সামন্তযুগের রাজকীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে প্রজাসাধারণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্র'-র ধারণা জন্মলাভ করে। বস্তুত, 'রাজতন্ত্র' শব্দটির প্রতিবাক্য হিসাবেই রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডারে 'গণতন্ত্র' শব্দটির উদ্ভব। প্রকৃত শাসনক্ষমতা রাজার (বা সামন্তযুগীয় ভূস্বামীর) হাতে ন্যস্ত থাকলে, সে ব্যবস্থাকে 'রাজতন্ত্র' বলা হত। তার বিপরীতে 'গণতন্ত্র' হল সেই ধরণের শাসন ক্ষমতা যাতে জনগণের হাতে—অর্থাৎ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর হাতে—শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। 'গণতন্ত্র'কে বাহন করেই ধনতন্ত্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে তার বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত অর্থনীতির সংকট থেকে মানুষের মুক্তি অর্জনের জন্য উদীয়মান শিল্পপতিদের নেতৃত্ব যে সমাজ বিপ্লব ঘটে, তার রাজনৈতিক মূলমন্ত্র হিসাবেই 'গণতন্ত্র'-এর আবির্ভাব। সামন্তযুগীয় রাজশক্তির হাত থেকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর হাতে সেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা—এই ছিল সেকালে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ। তখনকার দিনের সমাজ বিপ্লবের প্রাগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন নেতারা মনে করেছিলেন যে, এই রাজনৈতিক পথ ধরেই শোষিত জনসাধারণের আর্থনীতিক এবং সামাজিক মুক্তি অর্জিত হবে। সেযুগে 'গণতন্ত্র' ছিল প্রধানত একটি রাজনৈতিক ধারণা। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র-সম্পর্কিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হলেই তাকে বর্তমান যুগে 'গণতন্ত্র' বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। কারণ এই 'গণতন্ত্র-'এ গণ-এর উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রান্তিক। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবলুপ্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গ্যারাণ্টিকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত বলে স্বীকৃত হয় না।

দুর্ভাগ্য হলে'ও একথা সত্যি যে আমাদের দেশে আজও প্রচুর সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি গণতন্ত্রের প্রাচীন ধারণাকেই আঁকড়ে বসে আছেন। তাঁরা মনে করেন, সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। গণ পরিষদে যে-সব জাতীয় নেতা এদেশে সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই বিলাতী কায়দায় পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় গণতন্ত্রই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একমাত্র রূপ বলে মনে হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়া উদারনৈতিক জীবনদর্শনকে নিজেদের জীবনদর্শনের সঙ্গে এক করে নিয়েছিলেন। ফলে কোন দিনই তাঁরা পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্যতর রাষ্ট্রকাঠামোর কথা ভাবতে পারেননি। একথা সবিস্তারে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দেশ বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় আপস-আলোচনার পরিণতি হিসাবে এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। এই ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত। এই নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতি-স্বরূপই আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তিকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার ও ভোটের অধিকার কার্যকর হয়েছিল। তারপরে সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছে। একদিকে পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা ও অন্যদিকে বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। বেড়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জটিলতা। ইতিহাসের এই পর্বে কেবল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করলেই শ্রেণীদ্বন্দ্বজীর্ণ ধনিক সমাজের জটিলতাসমূহ সমাধান করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গভীর সংশয় পোষণের অবকাশ আছে।

দুই

সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ শ্রমকারী মানুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের

ধারণা কি তা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন সংস্থা নয়। ইতিহাসের কোন পর্বেই, কোন দেশেই রাষ্ট্র বিশেষ স্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়নি। বিপুল সংখ্যাধিক শোষিত জনগণকে দমন করে রাখাই ধনিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোর অভিন্ন সম্পর্ক। রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি যদি ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই রাষ্ট্র ধনিক ব্যবস্থার পরিপোষকতা করবেই—এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রে সশস্ত্রবাহিনী একমাত্র সরকারের অধীনে থাকে। সবচেয়ে নিখুঁত ও উন্নত ধরনের ধনিক রাষ্ট্র হল পার্লামেণ্ট বা সংসদের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। এতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পার্লামেণ্টের ওপর; রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শাসনের যন্ত্র ও সংগঠন তৈরি হয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে; যেমন নিয়মানুযায়ী গঠিত হয় বিরাট সৈন্যবাহিনী, পুলিস বাহিনী এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামো—এগুলো স্থায়ী সংগঠন। এরা বহু রকমের সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং সব সময় জনগণের নাগালের বাইরে থাকে।

আমাদের দেশের সংবিধানে বুর্জোয়া সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্যারাণ্টি দেওয়া এবং কাজ পাবার অধিকারকে বিচার বিভাগের সম্মুখে হাজির করার যোগ্য নয় বলে নির্দিষ্ট নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভূত করার পেছনে কোন্ শক্তি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা ভেবে দেখার মত।

আমাদের দেশের সংবিধানের মুখবন্ধে যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের স্বরূপ বোঝার পক্ষে তা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ভারত রাষ্ট্রকে কেবল বুর্জোয়া বা ধনিক রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করলে এর খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে। এই রাষ্ট্র বুর্জোয়া জনকল্যাণ বা হিতব্রত রাষ্ট্র বা সমাজসেবামূলক রাষ্ট্র। ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু যুগে গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কোন কোন দেশে শাসকশ্রেণী ধনবাদী স্বত্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকাঠামোকে বাঁচানোর জন্যে গণতন্ত্রের বহিরাবরণ ত্যাগ করে সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে দেয়, আবার কোথাও কোথাও বা জনকল্যাণ-ব্রতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধনিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ক্ষয়কারী শক্তির ফলে উদ্ভূত বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হয়। বহু প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ-কথা বহু এবং সুবিন্যস্ত যুক্তিসহযোগে প্রমাণ করেছেন যে, পুলিস রাষ্ট্র জনকল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রে পরিণত হলেই তার ধনিক শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হয় না। ধনতন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যাবলীরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত মনে রাখা দরকার যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র শ্রেণী-নিরপেক্ষ বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত নয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের কারণে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হয় না। তৃতীয়ত, ধনিক গণতন্ত্রকে আদর্শ রাষ্ট্ররূপ ও শাসন ব্যবস্থা সংগঠনের একমাত্র প্রকৃষ্ট রূপ বলে চিহ্নিত করা ইতিহাসসিদ্ধ নয় এবং তা বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রকে কায়েম রাখার যুক্তিগ্রাহ্য চেষ্টা মাত্র। চতুর্থত, বলা হয়ে থাকে যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে (যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বর্তমান) ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার কুফল প্রতিহত করার উপায় খোলা থাকে। এ-দাবিও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের অভিজ্ঞতা এ-কথাই সাক্ষ্য দেয় যে সামাজিক-আর্থনীতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ধনিকশ্রেণীকে প্রকারান্তরে সহায়তাই করে থাকে। শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্যে কল্যাণমূলক যে-সব ব্যবস্থা করা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন তার বোঝা আর্থিকভাবে দুর্বল ধনিক শ্রেণীকে আর বহন করতে হয় না; রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি কাজে আর্থিক সহায়তা যোগায় এবং কর নীতি প্রভৃতিও এমনভাবে রচিত হয় যাতে ধনিকশ্রেণীর সুবিধাই হয় বেশী। জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্র-মালিকানাধীন অংশ (যা রাষ্ট্রীয় পুঁজি-বাদেরই নামান্তর) মূলগতভাবে ব্যক্তি-মালিকানাধীন অংশকে পুষ্ট করে থাকে। রাষ্ট্র এমন সব আইন কানুন রচনা করে থাকে যাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা ধনিক শোষণের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে ধর্মঘট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর শ্রেণী-শোষণ ও শাসনের কাজে লাগে।

বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বৈত ভূমিকা। একদিকে সে ব্যক্তিমালিকানার অধিকারকে রক্ষা করে এবং অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের নামে ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

তিন

আগেই বলা হয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্র লোকশাসন নয়। আমাদের দেশের গণতন্ত্রেরও একই অবস্থা। এদেশে সার্ব-জনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিধান বলে পরিচিত। আমাদের দেশে সংবিধানে নির্দিষ্ট বছর (মূল শাসনতন্ত্রে ছিল পাঁচ বছর অন্তর, সংশোধনের ফলে দাঁড়িয়েছে ছ বছর, এই সংশোধন পুনঃ সংশোধিত করে পাঁচ বছর হবে বলে আশা করা যায়) অন্তর রাজ্যেরাজ্যে বিধান সভার ও কেন্দ্রে লোকসভার নির্বাচন হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয় প্রার্থীদের ভেতর থেকে ভোটাররা ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ তারা রাজ্যে ও কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। দেশের শাসন ক্ষমতা

রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিভক্ত, মূল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে; উভয়ত দেশ শাসনের নীতি স্থির করে মন্ত্রিসভা, নীতি কার্যকরী করে আমলাতন্ত্র। দৈনন্দিন ও আঞ্চলিক শাসন আমলাদের হাতে। এই ব্যবস্থাটিকে আমরা বলি ভারতীয় গণতন্ত্র—কারণ প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর ভোটে এর আইনসভা গঠিত হয় এবং সরকারকে এই সভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এই শাসন ব্যবস্থায় যে সাধারণ লোকের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর কোন ভূমিকাই নেই তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গণতন্ত্র এখানে অসম্পূর্ণ। তাই ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়ণের কথা উঠেছে। কেন্দ্রে আসীন শাসক দল বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়ণে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগের একটি কমিটি (বলবন্ত রায়-মেহতা টীম) তাদের রিপোর্টেও বিকেন্দ্রায়ণের পক্ষে সুস্পষ্ট-ভাবে সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবটি সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল চলতি আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো বজায় রেখে গ্রামস্তর থেকে পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারবে কি? এই প্রস্তাব বাস্ত-বায়িত হবার সম্ভাবনা কোথায়?

চার

অনেকে আবার পার্লামেণ্টারী নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ বহুমতের ভিত্তিতে গঠিত শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু ধনিক কবলিত সমাজে পার্লামেণ্টারী নির্বাচনের মারফত যে সত্যিকারের গণতন্ত্র (যে-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দেয় ও মৌলিক অধিকার ভোগের বাস্তব অবস্থা বর্তমান থাকে) প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বিভিন্ন ধনিক দেশের দিকে তাকালেও তা বোঝা যাবে। নির্বাচনের পথে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কাঠামোর পরিবর্তনের কথা ভাবা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে ধনিক রাষ্ট্রের সমাজবাদী রূপান্তরের কথা বাদ দিলেও ধনিক গণতন্ত্রে (বিশেষত ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু যুগেও আমাদের মত অনুন্নত ধনিক অর্থনীতির দেশে) গণতান্ত্রিক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করে তোলাও সম্ভবপর হয় না।

পাঁচ

এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বহিরাবরণ অটুট রেখে (অর্থাৎ পার্লামেণ্ট না ভেঙে দিয়ে) কিভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করা হয়েছিল, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সংবিধানকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর আঘাত হানা হয়েছিল এবং স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা হয়েছিল তা সকলেরই জানা কথা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পথে সে অশুভ, বিপজ্জনক ও সর্বনাশা ধারাকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু তা থেকে এ-সিদ্ধান্ত করলে ভুল করা হবে যে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ, ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনীতির ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, যা কাঠামোগত।

ছয়

পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ধনিক শ্রেণী-শাসন ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও চলতি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকামী সমাজবিপ্লবীরা ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অন্য ধরণের শ্রেণী-শাসন অপেক্ষা পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এবং পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য স্বৈরতন্ত্রী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তারা সচেষ্ট হন। তার কারণ, পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় বা সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মেহনতী মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত করা, সচেতন করা এবং সংগঠিত করার বেশী অবকাশ থাকে।

সমাজ বিপ্লবীদের কাছে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। তাঁরা মনে করেন যে জনগণের সার্ব-ভৌমত্বের অধিকারের বিকাশের পথে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র একটি অধ্যায়, যার প্রগতিশীল উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের। এবং সে দায়িত্ব পালন একমাত্র সম্ভবপর শ্রমজীবী জনতার স্ব-উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে। ধনিক ব্যবস্থার মধ্যে যে-সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান তাকে অতি প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয় এবং যদি কেউ ভেবে থাকেন যে চলতি কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার চেষ্টাই যথেষ্ট তবে তা ভুল হবে। অভিজ্ঞতা একথা বলে যে ধনিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রবিরোধী দক্ষিণপন্থী অতিপ্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরতন্ত্রী, ফ্যাসীবাদী, আধা ফ্যাসীবাদী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে থাকে। সেই কারণে যে সামাজিক কাঠামোর ভিতরে গণতন্ত্রকে বিনাশের চেষ্টা হয় সেই কাঠামোকে অক্ষত রেখে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করা যায় না। যে বাস্তব ভিত্তিভূমি থেকে প্রতিক্রিয়াবাদ উদ্ভূত হচ্ছে তাকে রূপান্তরিত করার কাজে অগ্রসর হতে হয়। কারণ, ধনিক শাসন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। আজকের যুগে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে, রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিকাংশ মানুষের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। শ্রমজীবী জনতার গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই লোকশাসনের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হতে পারে। এইটেই ইতিহাস নির্দেশিত পথ। এদেশেও সেই ঐতিহাসিক নিয়মের একক ব্যতিক্রম নয়।

[এই পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য তাঁদের নিজস্ব। এজন্য সম্পাদক-মণ্ডলী দায়ী নয়।]

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

গণতন্ত্র: গ্রামীণ স্তরে

"গণতন্ত্র" কথাটি এত বেশি ব্যবহৃত হয় যে এর এমন কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন যা সকলেই একবাক্যে মেনে নেবেন। একটা রূপক ব্যবহার করে বলা হয় যে 'গণতন্ত্র' হলো সেই টুপির মতো যা এত লোক মাথায় পরেছে যে তার মূল রূপ বা মাপ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সব রকম তর্কবিতর্ক মেনে নিয়ে অন্তত এইটুকু বলা যায় যে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র সকল মানুষের মানবিক মর্যদায় বিশ্বাস করে। স্বাধীনতা ও সাম্য হলো গণতন্ত্রের মূল সুর। গণতন্ত্রের সাধনা অনেক দিনের। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের নগর রাষ্ট্রে এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি নগরে এক ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় ছিল। যেখানে জন-প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল এবং কোথাও কোথাও সেনানায়ক বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও নির্বাচন করা হতো। এরকম প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব সেইসব সমাজেই যেখানে লোকসংখ্যা বর্তমানের মাপকাঠিতে অত্যন্ত কম। আজকের সমাজে এরকম প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা একেবারেই অসম্ভব। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মানুষের মতামত জানার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েক বছর অন্তর নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সুযোগ আসে নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রতিনিধি নির্বাচনের এই অধিকারটি হলো একটি মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-গুলি যাঁরা নির্ধারণ করবেন তাঁদের পছন্দ করার অধিকারটি হলো ভোটাধিকার। এই ভোটাধিকার একবার প্রয়োগ করার পর কিছু সময় সাধারণ নাগরিককে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচারবুদ্ধি ও মতিগতির ওপর নির্ভর করতেই হয়। তবে যদি নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিরোধী কোন কাজ করতে উদ্যত হন, যদি তাঁরা ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হন, যদি দেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নষ্ট করতে বসেন বা যদি শাসনের নামে জনসাধারণের জন্য শুধু শোষণ ও বঞ্চনারই ব্যবস্থা করেন, তাহলে জনসাধারণের নিশ্চয়ই এমন কোন সুযোগ থাকা উচিত যার ফলে জনসাধারণ আর নির্বাচনের ভণিতার জন্য অপেক্ষা নাও করতে পারেন। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি, অনাচার ও ভ্রষ্টাচারের প্রাধান্য থাকলে শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক নির্বাচন গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন না বটে কিন্তু দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটা সুস্থতা থাকুক এটুকু দাবী করা বা সেই প্রত্যাশা যাতে ফলবতী হতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হওয়ার অধিকার তাঁদের সবসময়েই থাকে। ন্যূনতমভাবে যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজে আশা করা হয় যে, দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে যথাযথ সৎভাবে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা হবে এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব সেখানে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

মূলত এই ধারণা থেকেই মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এমন এক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করতে যেখানে দেশের বৃহত্তম অংশ হওয়া সত্ত্বেও যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত থেকেছে সেই গ্রামের মানুষ যেন বুঝতে পারে—যে সে স্বাধীন। বৃটিশ প্রভুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সংগ্রামের শেষ বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগেই নয়—একথা গান্ধীজী বা নেতাজীর মত দেশ-নায়কগণ বার বার বলেছেন। আসল কথা গ্রামে গাঁথা বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষে কোনরকম শাসনব্যবস্থাই জনপ্রিয় বা সন্তোষজনক হবে না যতক্ষণ না সেটা গণতন্ত্রের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং কোনরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কার্যকরী হবে না যতক্ষণ না গণতন্ত্রকে গ্রামীণ স্তরে সফল করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নানা দিক থেকেই প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের মানুষ দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য বা মতামত প্রকাশ করবে শুধু এজন্যই গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের প্রয়োজন তা নয়। এছাড়াও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গ্রামের মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা দেশ ও সমাজের শ্রী-সমৃদ্ধি বাড়ানোর কাজে। কিন্তু ভারতবর্ষে কোনদিনই তাঁদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ না কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁদের বুঝতে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের দেশ ও সমাজের বৃহত্তম ও প্রধানতম শক্তি। ভারতবর্ষের সমাজনীতি ও অর্থনীতি এমনই যে যদি গ্রামগুলি ধ্বংস হয় তাহলে গোটা দেশটাই ক্রমশ ধ্বংসের পথে যাবে। কয়েক শতাব্দীর আলস্য ও কুসংস্কার কাটিয়ে শহরের আলোকপ্রাপ্ত (এবং সময় সময় ধূর্ত) মানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেকে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশীদার মনে করা গ্রামের মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অথচ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অর্থনীতি-সমাজনীতি নিয়ে যে কেউ চিন্তা করেছেন প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গ্রামের মানুষকে

যে কোন ভাবেই হোক্ দেশের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করতে হবে।

স্বাধীন ভারতে সরকারী স্তরে প্রথম এই উপলব্ধি ঘটে প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা শেষ হওয়ার পরে। প্রথম যোজনার সময় দুটি পরিকল্পনা চালু হয়: 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' ১৯৫২ সালে এবং 'জাতীয় এক্সটেন্‌সন্ সার্ভিস্' ১৯৫৩ সালে। এদুটি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করা। সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে কতকগুলি 'উন্নয়ন ব্লকে' ভাগ করা হয় এবং প্রতি ব্লকে একজন ব্লক বিকাশ আধিকারিক (বি. ডি. ও.) নিযুক্ত হন। সরকারের প্রত্যাশা ছিল ব্লক বিকাশ আধিকারিকগণ গ্রামের মানুষকে তার জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের পথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাহায্য এবং সর্বোপরি নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সারা ভারত জুড়ে সরকারের পক্ষে অর্থব্যয় ও প্রচার প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হলো না। প্রধান মন্ত্রী নেহরু আগ্রহ দেখালেন এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বার করতে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে আহ্বান জানালেন এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই পরিষদ নিয়োগ করলেন একটি অনুসন্ধান কমিটি যার সভাপতি হলেন বলবন্ত রায় মেহতা। উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ উন্নয়নের পথে বাধা কি এবং সেই বাধা দূর করার পথ খুঁজে বার করা। মেহতা কমিটি ঘুরলেন সমস্ত ভারতবর্ষ, আলোচনা করলেন বিভিন্ন প্রশাসক, নেতা ও সমাজ কর্মীদের সঙ্গে। পরিশেষে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানালেন ১৯৫৭ সালের প্রতিবেদনে। মূল বক্তব্য একটি: গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে না দিলে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামের মানুষের সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব।

মেহতা কমিটি সমাধান বার করলেন: বিকেন্দ্রীকরণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতাকে স্তরে স্তরে প্রয়োজনমত বিকেন্দ্রিত করতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে গ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব তাঁদেরই। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ও আমলাবৃন্দ থাকবেন প্রয়োজনীয় কারীগরী সাহায্য ও প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আর এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের নীতি মেনে চলতে হবে। তবেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে টেনে আনা যাবে দেশগঠনের কাজে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার নতুন বিকেন্দ্রিত রূপ গড়ে তুলতে হবে যার ভিত্তি হবে বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত পঞ্চায়েত। গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই প্রস্তাবের নাম পঞ্চায়েতের শাসন বা 'পঞ্চায়েত-ই-রাজ"। নিজস্ব গুণেই মেহতা কমিটির প্রস্তাব সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হলো। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, যোজনা পর্ষদ, ও ভারত সরকার প্রত্যেকেই গ্রহণ করলেন এই বৈপ্লবিক সুপারিশ। রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হলো অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এইভাবেই শুরু।

প্রথম এগিয়ে এলেন রাজস্থান সরকার। পরে পরে এলেন অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, বিহার, পশ্চিমবংগ এবং অন্যান্য সকল রাজ্য সরকার। প্রতিটি রাজ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রকে সফল করার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ যে পঞ্চায়েতী কাঠামো চালু করলেন সেটা মেহতা কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করেই গঠিত। এর তিনটি স্তর: গ্রাম, ব্লক ও জেলা। প্রতিটি স্তরেই আছে পঞ্চায়েত সভা; কিন্তু কেবল গ্রাম স্তরেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, অন্য দুস্তরে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর হলো ব্লক ভিত্তিক "পঞ্চায়েত সমিতি" এবং ব্লক বিকাশ আধিকারিক হলেন এই পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের প্রধান স্তম্ভ। তিনিই হলেন উর্দ্ধতম সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের যোগসূত্র। মহারাষ্ট্রে দেখা যায় আর এক ব্যবস্থা। সেখানেও নামে মাত্র তিন স্তরের কাঠামো, কিন্তু জেলা স্তরে "জেলা পরিষদ" হলো গ্রামীণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। গ্রামাঞ্চলের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রাজ্যসরকার জেলা পরিষদের হাতেই ন্যস্ত করেছেন। এই পরিষদ জেলার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। একে সাহায্য করেন এমন একজন অভিজ্ঞ আই. এ. এস্ অফিসার যিনি চাকুরীতে পদমর্যাদায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে উচ্চতর অফিসার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া জেলা প্রশাসনের বাকী সমস্ত দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদের হাতে। এর পরে আছে ব্লক স্তরে "পঞ্চায়েত সমিতি" যা প্রধানত জেলা পরিষদের আঞ্চলিক কমিটি হিসাবে কাজ করে—এই সমিতি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ব্লকের এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যরাই এই সমিতির সদস্য। সবশেষে আছে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত "গ্রাম পঞ্চায়েত" যা গ্রামের সীমিত ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের নির্দেশমত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ ও ১৯৬৪ সালের আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতী রাজের কাঠামো চার স্তরের: গ্রাম, ইউনিয়ন, ব্লক ও জেলা। পরে ১৯৭৩ সালের আইনে তিনস্তরের কাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে: গ্রাম, ব্লক ও জেলা, এবং প্রতি স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষে আরো অন্যান্য রাজ্যের গ্রামীণ গণতন্ত্রের কাঠামো পর্যালোচনা করলে এমন বহু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে। এই কাঠামোগত বৈচিত্র্যে আপত্তি করার কিছু নেই যদি অবশ্য আশানুরূপ ফললাভ ব্যাহত না হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে মহারাষ্ট্র। এখন অনেক রাজ্যই আবার নতুন করে ভাবছেন কিভাবে গ্রামীণ গণতন্ত্রের কাঠামোকে আরো জোরদার ও ফলপ্রসূ করা যায়। কিন্তু শুধু কাঠামোর অদল বদল করলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উন্নয়নের কাজে অনুপ্রাণিত করা যায় না। আসলে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই পোশাকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করার কর্মসূচী শুধু কথার কথাতেই থেকে গেছে। একমাত্র মহারাষ্ট্রেই উন্নয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রামীণ প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং ফললাভ ভালই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু একবার বলেছিলেন: আমি চাই এই জনপ্রিয় পঞ্চায়েতগুলি দশলক্ষ ভুল করুক, কেননা ভুল করে কাজ করতে করতেই গ্রামীণ গণতন্ত্রের নেতারা বৃহত্তর কাজের যোগ্য হয়ে উঠবেন। আদর্শ মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু কটি রাজ্যেই বা এই মহৎ আদর্শকে কাজে রূপ দেওয়ার ক্ষীণতম সৎ প্রচেষ্টা হয়েছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত আছে, নির্বাচন আছে (পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সে নির্বাচনও প্রায় চোদ্দ-পনের বছর বন্ধ আছে), জন প্রতিনিধিও আছেন। কিন্তু অর্থের অকুলান ও রাজ্য বা জেলা প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক খবরদারীর দাপটে গ্রামীণ গণতন্ত্রের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। গ্রামীণ স্তরের গণতন্ত্র পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কাজে কোন অর্থপূর্ণ বা ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করে নি।

'গণতন্ত্র: গ্রামীণ স্তরে' কথাটা শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু এর যথাযথ রূপায়ণে সবচেয়ে বড় বাধা বোধ হয় শহুরে সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রামের মানুষের সদিচ্ছা ও শক্তিতে অবিশ্বাস। গ্রামের মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশকে ও গ্রামীণ জীবনের সমস্যার স্বরূপকে সবচেয়ে ভালো জানে, অন্তত অল্পবয়স্ক এবং স্থানীয়ভাবে অপরিচিত কোন সরকারী আমলার চেয়ে বেশি জানে। কিন্তু আমলারাই সাধারণত ক্ষমতা ব্যবহার করেন ও ইচ্ছামতো তার ব্যাখ্যাও করেন। আর পঞ্চায়েতের হাতে থাকে সামান্য ক্ষমতা। আর আছে ছোট-বড়-মাঝারি সবরকম সরকারী আমলার হাতে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর খবরদারীর অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যবস্থা ছিল যার ফলে কিছু সরকারী আমলা পদাধিকার বলে ব্লক ও জেলা স্তরের পঞ্চায়েতের সদস্য হতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহার না করলেও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারে কুন্ঠিত ছিলেন না। নিরক্ষর অথচ বুদ্ধিমান গ্রামের মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারে যে, পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ে বিকাশ আধিকারিকের ক্ষমতা অনেক বেশি। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামীণ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা দুর্বল হতে থাকে। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতী রাজের নামে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের বদলে যা পাওয়া যায় তা হলো বিকেন্দ্রিত আমলাতন্ত্র।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে গ্রামের মানুষ যার থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত থেকেছে তা হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এ দুটো জিনিষ কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেদিন গ্রামে গ্রামে সুনিশ্চিত করা যাবে সেদিন আপনা থেকেই সম্পদ ও শ্রী ফিরে আসবে গ্রামাঞ্চলে। শিক্ষায়, বিশেষ করে প্রাথমিক ও কারীগরী শিক্ষার, ব্যাপকতম প্রসার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক প্রথাগুলিও এর ফলে ধীরে ধীরে লোপ পাবে এবং গ্রামের জনসাধারণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সজাগ হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টার শুরুও হওয়া দরকার গ্রামীণ স্তর থেকেই। পরিকল্পনার ছক প্রথমে গ্রামীণ স্তরেই স্থির করা প্রয়োজন; পরে যেসব কাজ গ্রামীণ স্তরে সম্ভব নয় সেগুলিকে রাজ্যস্তরে এবং যেসব কাজ রাজ্যস্তরে সম্ভব নয় সেগুলিকে জাতীয়স্তরে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এইভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পিরামিডের মত সাজাতে হবে যার পাদদেশে ব্যাপকতম জনসমর্থন থাকবে। গ্রামের নিরন্ন-অশিক্ষিত মানুষের দলকে শহরের দিকে ঠেলে পাঠায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিভিন্ন কুটির শিল্পের প্রসার, ছোট আয়তনের গ্রামীণ শিল্পায়ন, সেচের কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার, ব্যাপকহারে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, প্রতি মহকুমা শহরে পাইকারী ব্যবসার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের শহরমুখী গতি রোধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে গ্রামের মানুষের প্রয়োজন ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে এবং গ্রামের প্রতিনিধিদের মতামত এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মূল্যবান হবে। গ্রামীণ গণতন্ত্র এবিষয়ে খুবই ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে পারে। নয়তো শুধু পঞ্চায়েত ও নির্বাচন দিয়ে কোন ঐন্দ্রজালিক আশ্চর্য ঘটনা সৃষ্টি করা যাবে না। নির্বাচন গণতন্ত্রের গুরুপূর্ণ অংশ হলেও সব কথা নয়। এই ভাবেই গান্ধীজীর 'গ্রামরাজ' বা 'স্বরাজ'—এর স্বপ্ন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের 'সমবায়ী গণতন্ত্রে'র ধারণাকে রূপায়িত করার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ জাতীয় স্তরে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আর সেই একই যুক্তিতে গ্রামীণ স্তরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত করতে না পারলে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের সমস্ত প্রচেষ্টা রাজ্য বা জেলাস্তরের আমলাতন্ত্রের দৌরাত্মে শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। ভারতবর্ষের মত জনবহুল ও কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র শুধু একটা আদর্শ হয়েই যেন না থাকে। একে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা জাতীয় পুনর্গঠনের প্রধানতম অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া আর অন্য পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

নিরঞ্জন হালদার

১৯৭৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতার তিরিশ বছর পূর্ণ হল। দু বছর বাদে আমরা আবার গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অধিকার অর্জন করেছি। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ভারতে দ্বিতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতীয় নাগরিকেরা বেঁচে থাকারও আইনগত অধিকার হারান। ভারত সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীনীরেন দে'র যুক্তি মেনে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী এ. এন. রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বেঞ্চ ৪–১ ভোটে এই রায় দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এদেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি, ঐদিন কলকাতার গান্ধীমূর্তিতে মালা দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনেকে। ১৯৭৬ সালের পনেরো আগষ্ট সরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালিত হলেও, সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিলনা। গত মার্চ মাসের লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস দলের পরাজয়ের পর ভারতে আবার নতুন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। কোনো দেশে একবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, সে দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। কিন্তু ভারতে উনিশ মাসের একনায়ক শাসনের পর জনগণের ভোটে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত দেশগুলির মধ্যে ছোট্ট সিংহল বাদে একমাত্র ভারতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে টিঁকে আছে। অথচ স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশ ও বিদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী ভারতের মত্যো গরিব ও নিরক্ষরদের দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী বলে প্রচার করেছেন। কম্যুনিষ্ট ও অনেক অ-কম্যুনিষ্ট ব্যক্তি দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকে বিদায় দেওয়ার কথা বলেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টাও হয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকারকে তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে হায়দরাবাদ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে ভারতের সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং অপর দিকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটেছে। তারপর ১৯৬১ সালে গোয়ার ভারতভুক্তির ব্যাপারে পর্তুগালের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রান নিয়ে একবার এবং কাশ্মীর নিয়ে আর একবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ—এতগুলি যুদ্ধ রুশ-বিপ্লবের ৩০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে এবং গত সাতাশ বছরের কম্যুনিষ্ট রাজত্বে চীনকে করতে হয়নি। চীন ও রাশিয়া থেকে উদ্বাস্ত অন্যদেশে গিয়েছে, কিন্তু ভারতে পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি থেকে দলে দলে উদ্বাস্ত এসেছে বসবাসের জন্য। এই সব সমস্যার গুরুভার সত্ত্বেও ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকে ছিল ভারতের গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় ছিল বলে। ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং যে গণ আন্দোলন প্রতিটি মানুষকে সব কিছু বিচারের মাপকাঠি ভাবতে শিখিয়েছে, সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের লোভ পরিত্যাগ করার কথা বলেছে। গান্ধীজী জনগণের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করতেন বলে কখনোও সামরিক বাহিনীর লোকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেওয়ার কথা ভাবেননি। কারণ তিনি জানতেন, যে-সব পরাধীন দেশ সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেইসব দেশে সামরিক বাহিনীর নেতারাই শাসন-ক্ষমতা দখল করেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনশক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে ১৯৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহীদের সাহায্য নিয়ে তিনি ইংরেজকে আঘাত হানতে চাননি। গান্ধীজী একই সঙ্গে দেশে নতুন রাজনৈতিক ইনষ্টিটিউশান গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। কোন দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক কাজকর্মের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বজায় থাকা সেই দেশে রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় যদি গণতন্ত্রের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সেই দল ক্ষমতাসীন হলে দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রায় প্রতিটি পরাধীন দেশে একটা বড় রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। দেখা গিয়েছে, স্বাধীনতার পর ওইসব দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর গান্ধীজী কংগ্রেসের বিভিন্ন মতামতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের রীতি চালু করেন। এই রীতির জন্য কংগ্রেস সভাপতি বা সম্পাদকের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা হতেন ওয়ার্কিং কমিটির মুখপত্র। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বলতে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাত না, এই হাইকমাণ্ড গান্ধীজী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মতামতকে একাধিকবার অগ্রাহ্য করেছে। স্বাধীন ভারত একদলশাসিত দেশ হলেও কংগ্রেস দলের মধ্যে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বলেই এদেশে একনায়কত্ব চেপে বসতে পারেনি, সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রাধীন থাকায় প্রতিবেশী দেশগুলির মতো ঘটনাও

এদেশে ঘটতে পারেনি। ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে স্বীকৃতি দেওয়া হত বলে বিভিন্ন ধরনের কম্যুনিষ্টদের একাধিকবার সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা সফল হয়নি। মনে রাখা দরকার, যে-সব দেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করেছে, তার মধ্যে এক চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া আর কোনো দেশের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার কী, তা জানত না। ভারতে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের বিভাজন এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা করার কেউ অবশিষ্ট ছিল না। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটলে সেই দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সেই দলের নেতা বা নেত্রীর মর্জির উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর বাদে আমরা যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে চলেছি, সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আগামী দিনেও বজায় থাকবে কিনা, তা নির্ভর করবে প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা বজায় থাকা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর।

মনে রাখা দরকার, ১৯৭৫ সালের ২৬ জুনের আগে ভারতের নাগরিকদের সমান অধিকার ছিল, আইনের চোখে ছিলেন সকলেই সমান। জরুরী অবস্থায় একটার পর একটা আইন পাস বা সংবিধানের ধারা সংশোধন করিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। জনতা দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পর ৪৩-তম সংশোধন বিলের মাধ্যমে সেই সমানাধিকার ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস দলের বিরোধিতায় ফলে রাজ্যসভায় সেই বিল পাস হয়নি। এ ৪৩-তম সংশোধনে ৩৯-তম সংশোধন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা ছিল। ওই ৩৯-তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচারের অধিকার বিচার বিভাগের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধন ছাড়া ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের ৩১-ডি ধারাও নাগরিকদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এই ৩১-ডি ধারা অনুসারে সরকার যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়তা বিরোধী সংস্থা বলে বেআইনী ঘোষণা করতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ করা চলবে না। জরুরী অবস্থার সময়ে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যেভাবে সক্রিয় কিংবা সচেতন হয়েছিলেন, ভারতীয় সংবিধান থেকে গণতন্ত্র-বিরোধী ধারাগুলি অপসারণের ব্যাপারেও তেমনিভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন এবং তাহলে আমরা এদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারব।

সামাজিক ক্রান্তিসাধনে ভারতীয় সংসদ

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রথা বিলোপ হয়েছে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে। এই প্রথা বিলোপের জন্য নির্বাচিত সংসদ সংবিধানের প্রথম সংশোধনের দ্বারা ভূমি সংস্কারের আইনগুলিকে সুরক্ষিত করে। জমিদারী প্রথার বিলোপ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থা গ্রহণে ভারতের অগণ্য জনগণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে না যে এই প্রথা বিলোপের ২৫ বছর পরেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কমে নি। ভূমি সংস্কারের আদর্শ অধিকাংশ রাজ্যে অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পের মতই সরকারী দপ্তরের মহাফেজখানায় জমা হয়ে আছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে যে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন ছিলো ভারতের বহু রাজ্যে এখনো তা চলে আসছে। এবং তার জন্যেই ১৯৭৫-এ নতুন করে সংসদকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে বেগার শ্রমপ্রথাকে রদ করতে। হিন্দুকোড বিল, পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদি আইন পাশ করে হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রয়াস গ্রহণ করা হলো। ভারতবর্ষকে প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার বাসনা আন্তরিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সংসদীয় বিতর্কে। কিন্তু সংসদ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা ধর্মীয় অস্বাস্থ্যকর প্রথাগুলো সম্বন্ধে কখনই সরব হয়ে উঠতে পারে নি স্বাভাবিক কারণেই। ফলে সমগ্রভাবে সমাজব্যবস্থা তার ধর্মীয়, বর্ণীয় সব রকম স্তরবিন্যাসসহ—যা চলে আসছিল তাই রয়ে গিয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে অল্পই। কেননা শুধু আইন করলেই হয়না। আইন কার্যকরী করলে যাদের স্থায়ী স্বার্থে আঘাত পড়ে, আইন কার্যকরী করবার দায়িত্ব সেই সম্প্রদায় থেকেই আগত নতুন গড়ে ওঠা আর এক শ্রেণীর হাতে। আর এইখানেই ভারতীয় সংসদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সংসদ যে এ দায়িত্ব পালনে একেবারেই ব্যর্থ একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না।

গৃহীত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সংসদের পক্ষে তার দায়িত্ব পালনের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। এই প্রবন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে, আসলে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সামাজিক স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করে। এই অনগ্রসরতা থেকে মুক্তির জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার অনেক কিছুই ভারতবর্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, খনি, ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো এদিক থেকে সঠিক পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের সীমিত শহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থাগুলির ফল নিশ্চয়ই উপলব্ধি করা যায়। তবে ভারতের অধিকাংশ জনগণই গ্রামীণ। পরিবর্তনের প্রয়োজন তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী। এখানে বাহ্যত পরিবর্তনের এই গতি কেন ব্যাহত তার দুটি কারণ নির্দেশ করা যায়। যেমন জন্মহারের অতি দ্রুত বৃদ্ধি, এবং জন্মহার রোধের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের অভাব।

পরিশেষে, সংসদ জাতীয় জীবনের প্রয়োজন প্রয়োজনানুগ আইন প্রণয়ন করে সে আইন কার্যকর করবার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সরকার অনেক সময়ই ভুলে যায় সরকার সংসদেরই প্রতিনিধি। প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনা ক্ষমতার কেন্দ্রকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়, ক্ষমতা প্রয়োগ জনগণের জন্যই। তাই আইন প্রণয়ন করলেই হয়না। সেগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের মনে আশা আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে হয়। আইনের প্রয়োগের মধ মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনতে হয়। আর তখনই নতুন ভাবনা চিন্তার বিকাশ হয়। সমাজ সংস্কার বা পরিবর্তনের পথ তৈরী হয়। সার্বজনীন শিক্ষার ভূমিকা মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভারতবর্ষের সংসদ অনেক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেও সেগুলির ফল জনগণের দুয়ারে আজও পৌঁছে দিতে পারেনি, তার কারণ বোধ করি এই খানেই নিহীত আছে। বিগত ত্রিশ বছরে ভারতে শিক্ষিতের হার বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৯.৬ ভাগ। অর্থাৎ অশিক্ষিতের হার এখনো শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। অতএব আশ্চর্য হবার কারণ নেই—যে ভারতের জনগণের শতকরা ৭০ ভাগ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতে বাধ্য। আর এই দারিদ্র্যই ভারতের সমাজ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার জন্য দায়ী এবং ভবিষ্যতে সংসদের প্রধান ভূমিকা এই খানেই।

রাজ্যসভার ডাকটিকিট

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্বের জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে ভারত সরকার যে নিয়মিত ডাকটিকিটগুলির প্রচার করছেন, রাজ্যসভার ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট তাদের মধ্যে অন্যতম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাধীনতা লাভের সময় (১৯৪৭) ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ও অশোকস্তম্ভ যুক্ত ডাকটিকিট প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় (১৯৫০) চারটি ডাকটিকিট (বিজয় উৎসব, শিক্ষা, কৃষি ও কুটির শিল্প) এবং স্বাধীন ভারতের রজত-জয়ন্তী (১৯৭৩) উপলক্ষে দুটি ডাকটিকিট।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি; ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রস্তুতি ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ভারতের আত্মপ্রকাশ; এবং ১৯৫২ সালে ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিহাসের প্রায় শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, শাসক ও রাজন্যবর্গ মনোনয়নে ভারতবর্ষ নির্বাচনের নীতি পালন করে আসছে। মহাকাব্যগুলিতে তার সাক্ষ্য আছে। ব্রাহ্মণ্যে দেখা যায় জনপ্রিয় শাসককে মনোনয়ন করতো রাজকর্ত্রী নামীয় সংগঠন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, লিচ্ছবিরা রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করতেন। এই নির্বাচনকে বলা হতো ছন্দ, যার অর্থ ইচ্ছা। ভোটপত্র শলাকা নামে অভিহিত ছিল। এবং শলাকা-গ্রাহক এগুলি সংগ্রহ করতেন। এইসব প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরবর্তীকালে শত্রুর আক্রমণে ব্যাহত হয় এবং ভারত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর অনেক উত্থান পতনের ইতিহাস। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান সংবিধানের প্রবর্তনের পর আরম্ভ হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগ। পর পর ছটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র আজ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে লালচে বাদামী রঙের ডাকটিকিটটি মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে রয়েছে নির্বাচনের একটি চিত্র; আভ্যন্তরীণ চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি গ্রাম্য মহিলা ভোট দিচ্ছেন।

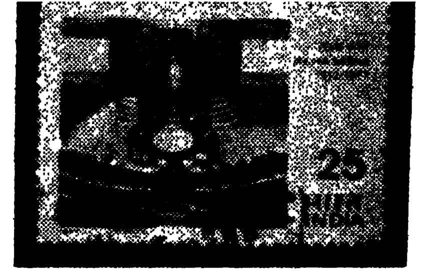


সাধারণ নির্বাচন ১৯৬৭



সংসদ ভবন

গত ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রী ভারতের পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অপক্ষপাতিত্ব, স্বাধীনতা, অবস্থা ও সুযোগের সাম্যতা—সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। ভারতের সংসদীয় সরকার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম ২৫ বছর নানা কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।



রাজ্যসভা ১৯৫২-৭৭

বিদেশী আক্রমণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। অনুন্নত দেশকে জীবনক্ষম, শক্তিশালী এবং আধুনিকতায় নিয়ে যেতে বিচিত্রধর্মী সমাজব্যবস্থায় অনেক টানা-পোড়েন সহ্য করতে হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা থাক৷ সত্ত্বেও, দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি নিরলস কাজ করে গিয়েছে। এবং এটি পরিষ্কার যে নতুন রাষ্ট্র তার সহজাত সুস্থত এবং আভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতার গুণে সময়ের এই আক্রমণের মোকাবিলা করেছে সংসদই হলো ভারতের সর্বোচ্চ সংস্থা। এর মাধ্যমে জনসাধারণ তাঁদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে পরিণত করেছেন; আবার নিজেদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরেছেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনগুলি দেখলেই অনুভব করা যায় যে, সংসদীয় সরকারের প্রতি দেশের কী গভীর আস্থা। প্রজাতন্ত্রের পঁচিশবর্ষ পূর্তিতে ডাকবিভাগ সেইজন্যে চমৎকার একটি ডাকটিকিট প্রচার করেন। ছবিতে সংসদ ভবনের চিত্র নীল, কাল আর রূপোলী রঙের সাহায্যে মহিমময় হয়ে ধরা পড়েছে। প্রকাশ কাল, ২৬শে, জানুয়ারী, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ভারতীয় সংসদ দুটি অঙ্গ—লোকসভা এবং রাজ্যসভা। এই দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থায় সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনের জন্যে প্রবহমান জনমত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিপারিষদে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব সহজ। এই সব কারণে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ৩রা এপ্রিল, ১৯৫২ সালে রাজ্যসভা

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর

কৃষ্ণ ধর

১৯৪৭-এর মধ্যরাতে আমরা শুনেছিলুম জওহরলালের কন্ঠে সেই বিখ্যাত 'ট্রিষ্ট্ উইথ ডেস্টিনি'র ভাষণ। অঙ্গীকার পূরণের সেই উজ্জ্বল শব্দাবলী সেদিনকার যুবকদের মনে নিশ্চিতই সঞ্চার করেছিল অনেক আশা আর স্বপ্নের রঙীন চিত্র। মধ্যরাতে স্বাধীন হলুম আমরা। পৃথিবীর অন্য সবাই যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখনই ছিল আমাদের বহুশতাব্দীর তন্দ্রাভঙ্গ। সে এক আশ্চর্য জাগরণ। কীভাবে আমরা সেই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছিলুম? আশা নিশ্চয় ছিল, সংশয়ও ছিল কম নয়। আনন্দের উল্লাসধ্বনি ছিল। অশ্রুভরা বেদনাও ছিল তার পাশাপাশি।

হাতের শেকল ছিঁড়ে সেদিন আমাদের ডাক দিয়েছিল চার অক্ষরের এই শব্দ— স্বাধীনতা। আমরা মুক্ত, আমরা বন্ধনহীন। আমরা এত দিন পর বুঝি বিশ্বসভায় আসন নিতে পেলুম ছাড়পত্র। বিনারক্তে তা উপার্জিত হয়নি। তার জন্য ভারতকে মূল্য দিতে হয়েছিল অসামান্য।

যদি সরাসরি কামান বন্দুকের লড়াইয়ে এই ঘটনা ঘটে যেত তাহলে যে রক্তপাত হত তার চেয়ে কম কিছু হয়নি। আমাদের বিপ্লবীরা বারবার বিদ্রোহ করেছেন। তার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা তারা দেখে যেতে পারেননি। ইংরেজরা তাঁদের হত্যা করেছে। আমরা তাঁদের দিয়েছি শহীদের সম্মান। কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেল তখন আমরা দেখলুম দেশটা দুভাগ হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, দেশছাড়া। হাজার হাজার মানুষ নিহত। সে এক নৃশংস গৃহযুদ্ধ।

সেই বেদনাতেই আচ্ছন্ন ছিল মহাত্মা-গান্ধীর সমস্ত মনপ্রাণ। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর উৎসব তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি; তিনি তখন বিহারের দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে পথ পরিক্রমা করছেন তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য। তাঁকে ডাকছিল তখন নোয়াখালির নিঃস্ব ভয়ার্ত মানুষ। তাঁকে ডাকছিল শাণিত ছুরির তলায় শায়িত কলকাতার বেলেঘাটা বস্তি। তাঁর মন্ত্রশিষ্য সেই অকুতোভয় দীর্ঘকায় পাঠান আব্দুল গফ্ফর খাঁ ভাবতেই পারেননি যে এমনটা হবে। তিনি বলে উঠলেন, কংগ্রেস আমাদের ঠেলে দিয়েছে নেকড়ের মুখে। আমাদের ভাষায় নতুন শব্দ চালু হল শরণার্থী। পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে চলল মানুষের দীর্ঘ, বেদনার্ত যাত্রা।

এই মূল্য দিয়ে কেনা স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে সেদিন পতাকা উঠল। আমরা পেলুম জাতীয় সঙ্গীত, পেলুম নতুন পতাকা। কী আশা ছিল আমাদের স্বাধীনতার কাছে? এ প্রশ্ন তো আমাদের কাছেও করতে পারে স্বাধীনতা নামক সামগ্রী? যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাঁদের হাতেই অর্পিত হল দেশকে চালাবার ভার। বিদেশী শাসন দেশকে শোষণই করেছে, তার বৈষয়িক উন্নয়নে উৎসাহ তার ছিলনা। সে তার শাসন ও শোষণের প্রয়োজনেই দেশে বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন চালু করেছিল, রেল লাইন পেতেছিল সারা দেশজোড়া। অল্পস্বল্প শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মূলধনের সিংহভাগ ছিল তাদেরই হাতে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন তারা করেছিল তাদের শাসনের সহযোগী শ্রেণী তৈরী করার জন্য। নিরক্ষরতা দূর করার কোনো প্রোগ্রাম তার ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতার কাছে বিস্তর প্রত্যাশা নিয়ে দেশের মানুষ যাত্রা শুরু করে ১৯৪৭ সালে।

গণপরিষদ বসানো হল ইংরেজ আমলেরই সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে। দেশের নায়ক যাঁরা সবাই তাঁরা ছিলেন সেই গণপরিষদে। স্বয়ং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন গণ পরিষদের সভাপতি। তিন বছর অনেক চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম করে হরিজন আইনমন্ত্রী ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর তৈরী করলেন লোকতান্ত্রিক ভারতের প্রথম সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতবর্ষ সেই সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ রিপাব্লিক রূপে ঘোষণা করল নিজেকে। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হলেন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

যে কোনো স্বাধীন দেশের মানুষের কতকগুলো ন্যূনতম আশা আকাঙ্খা থাকে। ভারতবর্ষ ইংরেজ কলোনিয়াল শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা, চরম নিরক্ষরতা, রুগ্ন শিল্প, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আর মুমূর্ষু অর্থনীতি। স্বাধীন হবার পর স্বভাবতই দেশের মানুষ ভাবল এবার তার পরিবর্তন হবে। গান্ধী মহারাজের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবার। সংবিধানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের বাক্ স্বাধীনতা জাতীয় বহুবাঞ্ছিত সমস্ত অধিকারই স্বীকৃত হল। সুরু হল ভারতের নতুন যাত্রা।

এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ-বাদের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হল ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে। পরাধীনতার জ্বালা ভারত জানত। তাই এশিয়া আফ্রিকা থেকে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য পঞ্চাশের দশকে সে নেয় মুখ্যভূমিকা। বিদেশনীতিতেও তার ভূমিকা হয় জোট-নিরপেক্ষতা। কোনো শক্তিশিবিরে সে থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আর জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন বিদেশনীতি— এই দুই ভূমিকাতেই ভারত সর্বত্র অভিনন্দন পায়। চীনের সঙ্গেও তখন থেকেই মৈত্রীর সূত্রপাত। আমরা মনে করতে পারি সে সময়টাই ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে সুসময়। তার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকত। ভারতবর্ষের মানুষেরও তখন গৌরব। ভারত তখন পঞ্চশীলের উদ্গাতা। আফ্রিকার প্রতিটি দেশ সাগ্রহে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের দিকে। আফ্রিকার নেতারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ভারত-বর্ষই আমাদের স্বাধীনতার প্রেরণা। ভারতবর্ষই আমাদের পথ দেখিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। আফ্রো-এশীয় মহামৈত্রীর স্বপ্ন তখন সার্থক হতে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে একে একে পশ্চাদপসরণ করছে ঔপনিবেশিক শক্তি। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতিরই সার্থকতা তাতে প্রমাণিত হল।

কিন্তু শুধু বাইরের হাততালিতে তো সব কিছু নিষ্পন্ন হয় না। ভারতকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার অন্য জাতীয় অর্থ-নীতির পুনর্বিন্যাসের তাগিদও ছিল সমান জরুরী। পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনাও সেই তাগিদ থেকেই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের নানা অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য অকাতরে অর্থব্যয়ও করেছেন। কলকারখানার পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু তৃতীয় পরি-কল্পনার মুখে জওহরলাল নেহরুকে তখন আক্ষেপ করতে শোনা গেছে, সেই টাকাগুলো গেল কোথায়? যতটুকু উন্নতি আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। সমাজের নিচুতলাতে যাদের বাস তাদের কাছে কি সেই হাজার হাজার কোটি টাকার তলানিটুকুও পৌঁছেচে? এর সুস্পষ্ট জবাব: না তা পৌঁছয়নি। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের সত্তরভাগ লোক এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে যাদের মাসিক আয় ১৯৬১ সালের মূল্যসূচক অনুযায়ী ২০ টাকার কম। এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে, অথচ নিরক্ষরতার কোনো সমাধান হয়নি। ভারতবর্ষে এখন প্রায় ২২ কোটি লোক নিরক্ষর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরদের সংখ্যাও বাড়বে। সংবিধানে বলা ছিল, ১৯৫০ থেকে দশ বছরের মধ্যে দেশে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য নিঃশুল্ক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। এটা ১৯৭৭ সাল। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যেই তা হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা দায়সারা গোছের। এই বিপুল নিরক্ষরতা ও শিশু কিশোরদের অশিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষকে চলতে হচ্ছে। এতে গৌরবের কিছু আছে কি?

অথচ এই ত্রিশ বছরে য়ুনিভার্সিটির সংখ্যা বেড়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার প্রতি যতটা নজর দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও সর্বজনীন করার দিকে সেই মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার ফলে উচ্চশিক্ষার বিস্ফোরণ যত প্রবলভাবে ঘটেছে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা বয়স্ক শিক্ষার নিঃশব্দ প্রসার সে তুলনায় কিছুই হয়নি। অথচ এর প্রয়োজনই ছিল সবচেয়ে বেশি। অগ্রাধিকার কোনটাকে দেওয়া হবে তা নিয়ে গোড়াতেই ছিল দ্বিধা। তার জন্যই এই পরিণতি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মূলে রয়েছে এই ব্যাপক নিরক্ষরতার অভিশাপ। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ সম্ভব হত না যদি দেশের মানুষকে গত ত্রিশ বছরে মোটামুটিভাবে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যেত। শিক্ষাব্যতিরেকে গণতন্ত্র বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন এমারজেন্সির পরবর্তীকালীন দুঃখজনক ও ভয়াবহ ঘটনায় তার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

অনেক ঠেকে আমরা শিখেছি আর পরের দুয়ারে হাত পাতা নয়। স্বনির্ভরতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কেননা বিনাস্বার্থে কেউ সাহায্য দেয়না। নিজের মাথা উঁচু করে চলতে হলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা চাই। কীভাবে তা সম্ভব তা নিয়েই অধুনা চর্চা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আমাদের পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজানো হবে। কোন জিনিষটা আগে দরকার তারই বিচার আগেভাগে করতে হবে। বৃহৎশিল্প নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষের উপায় যাতে হয় তার জন্য গ্রামভিত্তিক ছোটখাটো শিল্প না হলে এই অসম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? আমাদের দেশে এখনও মাল পরিবহণের প্রধান বাহন গরুরগাড়ি। দূর-দূরান্তরের গ্রামাঞ্চলে এছাড়া অন্য বাহন নেই। তাহলে বিদেশ থেকে সোনার দামে তেল কিনে এনে যান্ত্রিক পরিবহণ আর কতকাল আমরা চালাতে পারব? গরুর গাড়িকে কীভাবে আরও গতিশীল এবং ভারবাহী পশুর পক্ষে কম যন্ত্রণাদায়ক করে তোলা যায় তার একটা উপায় বার করা কি খুবই হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে? গরিব দেশের জন্য পশ্চিমী দেশের অতি আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যার পরিবর্তে দেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার উপযোগী প্রয়োগবিদ্যারই প্রয়োজন বেশি। এসব তত্ত্ব এখন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরাও বলছেন।

এখনও আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষি ব্যবস্থা। জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে গ্রামের জোতদাররা। ট্র্যাক্টর, কৃত্রিম সার, জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করছে

তারাই। ভূমিহীন খেতমজুর বর্গাদার চাষীর ভাগ্যের পরিবর্তন তাতে হয়নি। আইনের আড়ালে বেনামী জমির পরিমাণ বেড়েছে। সুতরাং কৃষিপ্রধান এবং মূলত জমির উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল দেশে ন্যায্য ভূমিসংস্কার যতদিন না হচ্ছে ততদিন মানুষের দুঃখ ঘুচবে না। ত্রিশ বছর পরও আমাদের এই কথাই বলতে হচ্ছে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিল না। তাঁরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রেরণা নিয়েই এই সংবিধান উত্তরকালের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল কথা পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিরোধী দলের সমালোচনার প্রতি সযত্ন মনোযোগ। গত ত্রিশ বছরে একটি বিকল্প শক্তিশালী বিরোধী দলের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব শাসক দলকে আত্মম্ভরিতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছিল। বিশেষ একজনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার মারাত্মক প্রবণতাও সেই ব্যাধিরই প্রতিক্রিয়া।

তা বলে এতকাল কি ভাল কাজ কিছুই হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। এশিয়ার অন্য অনেক দেশে গণতন্ত্রের শ্মশানবন্ধুরা যখন কফিনে করে তার শব নিয়ে গেছে গোরস্থানে, ভারতরাষ্ট্রের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ তখন ব্যালটপত্র হাতে নিয়ে নিয়ে আত্মম্ভরী একনায়কতন্ত্রী সরকারকে গদীচ্যুত করে এসেছে। এটাই ভারতবর্ষের পক্ষে বাঁচোয়া। গত ত্রিশ বছরে যা কিছু ভাল কাজ হয়েছে তার মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধরণ ধারণ ও কাঠামো বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষের এই সাহসী এবং সহজাত বিশ্বাস আমাদের দেশকে বিনাশ ও বিশৃংখলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আজ সেই সাধারণ মানুষকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁরাই গণতন্ত্রের রক্ষক এবং ভয় থেকে মুক্তির পথ তাঁরাই দেখিয়েছেন।

এই কিছুদিন আগেও তৎকালীন শাসকদের মুখে শোনা যেত আমাদের মতো দরিদ্র দেশে পাশ্চাত্যের মতো 'নরম' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাকি চলবেনা। সে কারণেই একে ওরা লোহার মত শক্ত করতে চেয়েছিলেন। কার স্বার্থে? এর উত্তর পাওয়া যাবে তদন্ত কমিশনগুলোর রায় যখন বেরুবে তখন। আমাদের দেশে লিবারেল ডেমোক্র্যাসি থাকবে কি না তা জনসাধারণই ঠিক করবে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতায় চিরস্থায়ী আসন দেবার জন্য তাকে দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ সেই সরল সত্য আবার উচ্চারণ করেছে সুস্পষ্ট ভাষায়। নিঃশব্দ কণ্ঠে। এখানেই তার জয়। ত্রিশ বছরের স্বাধীনতার সবচেয়ে সার্থক উচ্চারণ এটাই।



স্বাধীনতার আবহাওয়ায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আশা আকাঙ্খার পরিপূর্তি কী ভাবে হয় সে প্রশ্নও মনে জাগতে পারে। সাহিত্যিকরা ভাষা নিয়ে কাজ করেন, শিল্পীদের হাতে তুলি, চোখে স্বপ্ন। সাহিত্য আকাদমি বা সঙ্গীত নাটক আকাদমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে শিল্প সাহিত্যের পোষকতা করার সৎপ্রেরণা, কারই বা সমর্থন না পাবে: কিন্তু বৎসরান্তে কিছু পুরস্কার বা কাঞ্চনমূল্যে কোনো সাহিত্যকীর্তির উৎকর্ষ নিরূপণ তার শেষ কথা নয়। এর ভিতরকার চিত্র ততটা আলোকিত নয়। পুরস্কার দিয়ে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আনুগত্য আদায় করার গোপন ইচ্ছাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল গত এমারজেন্সির সময়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন যে শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্য সরকার এত পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন, আকাদমি করেছেন, কিন্তু তাঁরা সরকারকে যথেষ্ট সমর্থন করছেন না। কী সাংঘাতিক কথা। এর প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী দুর্গা ভগৎ তাঁর আকাদমি পুরস্কার ফিরিয়ে দেন এবং আকাদমির সদস্য পদও ছেড়ে দেন। যেমন করেছিলেন ফণীশ্বর নাথ রেণু তাঁর পদ্মশ্রী খেতাব ফিরিয়ে দিয়ে।

আসলে শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রশাসনের মানসিক তরঙ্গ সমান্তরাল নয়, এটা সরকারকে বুঝতে হবে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করেন, শিশির ভাদুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেন খেতাব। শিল্পীর স্বাধীন মর্যাদার প্রতি তাই আরও শ্রদ্ধাশীল আচরণই আকাঙ্ক্ষিত। ভাষা নিয়েও পরিষ্কার কোনো নীতি গড়ে না ওঠার ফলে প্রায়ই দেখা দেয় অবাঞ্ছিত ভাষা বিরোধ। খুবই আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি আমাদের দেশেরই একটি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে স্বীকৃতি পাবার জন্য আন্দোলন করতে হয়। আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছুই সরকারের স্বীকৃতি পায়না।

বহুভাষী দেশে সুয়োরাণী দুয়োরাণী ভাষানীতি সামাজিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভকেই জড়িয়ে রাখে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ভাষা নিয়ে বোঝাপড়া এখনও সম্ভব হয়নি। এতে কিন্তু সম্ভাব্য বিরোধের বীজ রয়েই গেল। এ সমস্তই আমাদের ত্রিশ বছরের স্বাধীনতার জমানো সমস্যা। তার যেখানে উজ্জ্বলতা সেখানে দাঁড়িয়ে ওই আবৃত অন্ধকারের দিকে তাকাই আমরা—তা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ হতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের আগেই ভারতবর্ষকে তার এই সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে, যদি আমরা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি

সুভাষ সমাজদার

আমাদের দাবী—
—মানতে হবে—মানতে হবে—

দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে চলেছে। থেকে থেকে তারা তীব্র উত্তেজনায় মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চারণ করছে কঠিন অপরাজেয় শপথ—তেলেগুভাষাভাষীদের জন্য আমরা একটা আলাদা অঙ্গরাজ্য চাই। তার জন্যে প্রয়োজন হলে আমরা খুন দেব—

আমাদের দাবী—

মানতে হবে—মানতে হবে—জনতার গগনভেদী সমর্থনের রোলে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। সেদিন বিশাখাপত্তনম, গুণ্টুর, বিজয়ওয়াড়া, রাজমুন্দ্রী, মাদ্রাজের পূর্বাঞ্চলের আরও অন্যান্য শহরের হাজারো জনতার কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এই দাবী—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকে তেলেগুস্পিকিং জেলাগুলোকে নিয়ে পৃথক করে সম্পূর্ণ পৃথক একটা প্রদেশ তৈরি করতে হবে—

এসব ১৯১৩ সালের কথা।

সেদিন এই আন্দোলনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির, তা জানা যায় না। কিন্তু সেই তীব্র উত্তেজনাময় আগ্নেয় পরিবেশে মহীশূরের পূর্বে কৃষ্ণ-মৃত্তিকার দেশ অনন্তপুর জেলার ইল্লুরু গ্রামের এক দরিদ্র আর নগণ্য কৃষকের ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক শিশু—

১৯শে মে, ১৯১৩। বলাবাহুল্য সেদিন নবজাতকের উদ্দেশ্যে শঙ্খধ্বনি হয় নি; মুখরিত হয় নি ইল্লুরুর বাতাস প্রতিবেশিনীদের উলুধ্বনিতে! নিতান্তই সাদামাটা ভাবে আর পাঁচটা ছেলের মতই সে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে আর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হতে লাগল।

ইল্লুরুর চারিদিকে দিগন্তবিসারী প্রান্তর। তার মাঝে মাঝে অসুরমুণ্ডের মত ছড়ানো ছোট ছোট টিলা, থেকে থেকে বেঁটে বেঁটে গাছের এলোমেলো জঙ্গল। সেই কৃষক বালক লক্ষ্য করতো সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের অহল্যা মাটিতে চাষীরা লাঙ্গল দেয়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কৃষকরা তাদেরই রক্তে সেই বন্ধ্যা মাটিতেই সবুজ ফসলের বিপুল সম্ভারে দিগন্ত পর্যন্ত তরঙ্গ তোলে। কিন্তু—হায় কে জানে কোন কারবারী হাতের মার-প্যাঁচে সেই ফসল কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। অজগর সাপের মত মহাজনের ঋণ-তাদের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে আর দুঃখে দারিদ্র্যে জীর্ণ হয়ে এক অবক্ষয়ী জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাদেরই দুঃখে গভীর সহানুভূতিতে বালকের মন কেমন ভারী—খুব ভারী হয়ে ওঠে আর তার চেতনার ভেতরে একটা স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে ওঠে একটি বলিষ্ঠ শপথ—বড় হয়ে সে এই মেহনতী মানুষের দুঃখ দূর করবে—তখন তার বয়স বারো।

তার সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর ১৯৬০ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল মহীশূরের সদাশিব-নগরে (বাঙ্গালোর)। সেই সভায় এ. আই. সি. সি.র প্রেসিডেণ্ট যাঁর ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, **In a country that is mainly agricultural like India, agriculture must play a dominant role** কৃষির উন্নতি না হলে ভারতের সমৃদ্ধি কিছুতেই হতে পারে না। কে এই সভাপতি?

আর কেউ নয়। তিনিই সেই অনন্তপুর জেলার ইল্লুর গ্রামের কৃষক বালক। আসমুদ্র হিমাচলের আজ সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক। দেশের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি।

বাবার নাম নীলম চিন্নাপ্পা রেড্ডি। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করেই ইল্লুরু থেকে অনেক-অনেক দূরে আদ্যারের (মাদ্রাজ) থিয়োসফিক্যাল হাইস্কুলে। পিতৃদেব চিন্নাপ্পার খুব নজর ছিল ছেলের লেখাপড়ার দিকে। তার চোখে স্বপ্ন নেমে আসতো—উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার এই ছেলে একদিন অনেক—অনেক বড় হবে—কিন্তু—

তাঁর স্বপ্নকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সঞ্জীব পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের কাজে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মত্ত বন্যায় সারা দেশ



মরণপণ করে সংগ্রামে আহ্বান করলেন— করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—Do or die ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সারি হিন্দুস্থানমে জ্বালামুখী ফুটেগী....শুরু হয়ে গেল ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলন। বলাবাহুল্য মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা সঞ্জীবকে আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯৪৫ সালে সঞ্জীব যখন মুক্তি পেলেন তখন দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার চলছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাদের দুইশো বছরের জমিদারী ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাই পালাই করছে। ১৯৪৬ সালে জনতার নেতা শুধু যে সঞ্জীব জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হলেন মাদ্রাজ বিধান সভায়—তা নয় কংগ্রেসী দলের (বিধান সভায়) সম্পাদকও মনোনীত হলেন। তারপর—তারপর ভারতের গণ-পরিষদের সভ্য থেকে শুরু করে কখনো অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রদেশের মন্ত্রী (১৯৪৯-৫১), কখনো অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি (১৯৫১-৫২) হয়ে ধাপে ধাপে দৃঢ়পায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তিনি। ইল্লুরু গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পেনার আর চিত্রবতী নদীর জলবায়ু পুষ্ট অনন্তপুর জেলার পরিধি পেরিয়ে তিনি একটু একটু ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশাল বিস্তীর্ণ আর বহুবচনাবৃত ভারতে। তাঁর ভেতরে পারিবারিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। পাঁচ বছরের ছেলে মারা গিয়েছে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। কিন্তু যাঁর রক্তের ভেতরে দেশসেবার প্রেরণা আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে, তাঁর অগ্রগতিকে রুখতে পারে না কোন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি।

সেই তাঁর জন্মলগ্নে (১৯১৩) তেলেগু ভাষাভাষী জেলাগুলো নিয়ে যে পৃথক প্রদেশের দাবী ছিল তা বাস্তবে রূপায়িত হলো তেতাল্লিশ বছর পরে (১৯৫৬) আর সেই নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ইল্লুরুর কৃষকের ছেলে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। যেই নিখিল ভারত

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

তখন আলোড়িত। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস ঘোষণা করল পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প। গান্ধীজী সারা দেশকে আইন অমান্য আন্দোলনে আহ্বান জানালেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুরু হলো বিলেতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। শুরু হলো মদের দোকানে দোকানে পিকেটিং। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন ডাণ্ডী মার্চ। সারা ভারতের উপমহাদেশ জুড়ে দেখা দিল ঝড়-বজ্র-বিদ্যুতের আগ্নেয় সূচনা। সঞ্জীব সেই সময় তাঁর কলেজে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারাবরণ করেন।

সেই শুরু।

তারপর যে কতবার তিনি কারাপ্রাচীরে অন্তরালে গিয়েছেন তার কোন লেখাজোখা নেই। সেই থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভিক সৈনিক। নিষ্ঠাবান, সৎ দেশ-প্রেমিক। তাই তিনি হলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৩৭)। এই পদে থেকে সঞ্জীব একটানা দশবছর ধরে দক্ষিণ ভারতের স্বদেশী আন্দোলনকে একটু একটু করে পুষ্ট করে তুলেছেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার অনন্তপুরে এক আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করার অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। দক্ষিণ ভারতের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো তরুণ সত্যাগ্রহী নেতা সঞ্জীব রেড্ডি। তাই তাঁকে জেল থেকে রিলিজ করে বাইরে রাখা তারা নিরাপদ মনে করল না। পাঠিয়ে দিল ভেলোর জেলে 'ডেটিনিউ' করে। দীর্ঘ দুই বছর পর যখন মুক্তি পেলেন তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ধুরন্ধর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস দৌত্য ব্যর্থ হলো। গান্ধীজী বজ্রকণ্ঠে সমগ্র জাতিকে



আসলে স্বাধীনতা ব্যাপারটাই ভারি গোলমেলে। কতটা স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতে পারে, কতটা পারেনা তার একটা সীমারেখা টেনে দিতেই হয়। বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে সম্পদ যেখানে খুবই সীমিত, প্রজনন যেখানে অপরিমিত সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে নিরাপদের প্রশ্নটারই গলা বাড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিক। সমষ্টিগত ভাবনা কাজ করে না। করলেও তা গোষ্ঠবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেখা গেছে বার বার। তখন ধর্মঘট চলে। যে যত বেশি সংঘবদ্ধ তার আশু পাওনা তত বেশি। তলাকার লোকেদের কথা তারা আদৌ ভাবে না।

আর তখনই আমি এক দুঃখী বালকের মুখ দেখি ফুটপাথে। সে ঘাড় হেঁট করে চলে যাচ্ছে না। মাথা উঁচু করে একের পর এক সুখী জানালায় ভেংচি কেটে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একদিন তাকে হাতের নাগালে পেয়ে বললাম, এই তোর কী নাম রে। সে নাম বলল, নুটু। শহরে সে তার মায়ের খোঁজে এসেছে। সে বলল, দেখছি, আপনারা আমার মাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? ভারি উদ্ধত তার কথা বলার ভঙ্গী। তারপরই চোখ কেমন তার সজল হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পর নুটুকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যায় না। তখন রেল-ধর্মঘট চলছিল। রেলে মাঝারি ধরনের কাজ করে এমন এক বিজয় নামে ব্যক্তির সঙ্গে তখন বেশ সুসম্পর্ক ছিল আমার। মাঝে মাঝে দেখা হলেই বলতাম, কী মনে হচ্ছে? সাকসেসফুল অর আনসাকসেসফুল। সে প্রথম দিকে জোর দিয়ে বলত, সেন্ট পার্সেন্ট। তারপর ক'দিন যেতে না যেতেই সে একদিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। বলল, ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। ইউনিয়নের পাণ্ডা, ফ্যাসাদ হতেই পারে— বললাম, তাহলে আনসাকসেসফুল। সে বলল, ধুস, আমাদের চারু, চারুকে চেননা। তখন কি ভালমানুষ। কেউ নেই বাবু। ঝাড়া হাত পা। বাড়ির কাজে এত বিজ্ঞাপনটন দিয়ে ঝাড়া হাত পা লোক চাইলাম. তাই সেই শেষ পর্যন্ত....! বললাম. কেন তুমিতো বলেছিলে, মেয়েটি বেশ, কেউ নেই। ছুটিছাটা চায় না। বিশ্বাসী। চারু না হলে তোমারতো একদিন চলে না শুনেছি। রীতিমতো ইণ্টারভিউ নিয়ে চাকরি।

—তোমার সত্যি বলছ কেউ নেই? —না। ছেলে? না। ভাই? না। কারো ওপর কোনো টান নেইত। না বাবু। তোমার স্বামী আছে? খোঁজ নেই। —খোঁজ নেই কেন? চারু বলতে পারত মানুষটা বিষয়ী ছিল না বাবু। আপনাদের মত চালাক ছিল না বাবু। কি করে দু পয়সা বেশি কামাতে হয় জানত না। সরল হাবা গোবা হলে যা হয় মানুষের। এ-সব কথাও আমার মনে এসে গেল কেন জানি। বিজয়ের স্ত্রী অধ্যাপিকা। সংসারে স্ত্রী এক ছেলে এক মেয়ে। ইতিমধ্যেই সে শহরের একটু বাইরে বেশ সুন্দর ছিমছাম বাড়ি করেছে। এমন একজন সুখী লোকের কি আবার ফ্যাসাদ হল।

বিজয় বলল, চারুর একটা বখাটে ছেলে আছে। কি যে মুসকিল, যতবার দিয়ে আসি দেশে, ততবার এসে দেখি আমার আগেই পৌঁছে গেছে। লাথি মারব এমন মাজায়! বেশ গালাগাল দিতে গিয়ে বলল, তোমার বৌদি বলছে বাড়ি বেচে দেবে। খাচ্ছেনা দাচ্ছেনা। রাতে ঘুমোচ্ছে না।

—ঘুমোচ্ছে না কেন?

—চারুর আজকাল রাতে চুরি করার স্বভাব দাঁড়িয়েছে। কখন জানালায় এসে খাবার চুরি করে নিয়ে যায় ছেলেটা আমরা ধরতে পারছি না। ভারি তাঁদর।

বললাম, তাড়িয়ে দাও।

—তাড়িয়ে দেব, এমন বিশ্বাসী লোক পাব কোথায়।

—তা অবশ্য মুশকিলেই পড়েছ।

—মুশকিল বলতে, যত বলি তোর কি চাই, কি পেলে তুই আর আসবি না, তত বায়নাক্কা বেড়ে যায়। বলল, পিঠে পায়েস খাওয়ান, খাওয়ালাম। বলল, ঘুড়ি লাটাই পেলে সে ঠিক দেশে চলে যাবে--দিলাম। কিন্তু যায়না। ঘুরে ফিরে চলে আসে। নোংরা। ঘর দোর সব আমার যেতে বসেছে।

বললাম, তা হলে সেন্ট পার্সেণ্ট সাকসেস।

—সেণ্ট পার্সেণ্টের ওপরে। তবে মাজায় এমন একদিন লাথি কষাব না! ধরতে পারলে হয়। এখন কখন আসে কখন যায় টেরই পাই না। তোমার বৌদি কলেজে, আমি অফিসে, ছেলে মেয়ে স্কুলে, বল স্বাধীনতা এর চেয়ে আর কত বেশি দরকার চাকুর। সে সবই এখন দিয়ে দিতে পারে। তোমার বৌদির মাথাটা এখনও ঠিক রাখতে পেরেছে সেই রক্ষে। পাগল টাগল না হয়ে যায়। তারপর বলল, আমাকে একটা তালপাতার টুপি কিনে দেবেন বাবু? রাগে শরীর কাঁপছিল। সব সামলে বললাম, চল কোথায় পাওয়া যায় দেখি এবং সারা টেরিটিবাজার ঘুরে অবশেষে টুপি কিনে দিয়ে বললাম দেশে গিয়ে ভাল হয়ে থাকলে আরও পাবি। সেই যে গিয়েছিল আর আসে নি। ভেবেছিলাম সত্যি সৎস্বভাবের মানুষ হয়ে গেছে নুটু। আর আসবে না। আজ বাড়ি ফিরে শুনি, তোমার বৌদি বলছে, এসেছে।

বিজয় ফের বলল, আমাকে যে বলে গেল আর আসবেনা। জবাবে তোমার বৌদি বলল, আমাকে বাজে বকিওনা মাথা ধরেছে। বিজয়ের কেমন হুঁশ ছিল না। সংসারের সঞ্চিত ঐশ্বর্য কেউ তার কেড়ে নিচ্ছে যেন।

—কোথায়। পায়ের রক্ত বিজয়ের মাথায় উঠে এসেছে। প্রায় অতিকায় জীবনহানিকর কিছু একটা ঘটনা। সব সুখ কেড়ে নিতে আসছে। সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে চিৎকার করে ডেকেছিল, চারু চারু। চারু এলে সে বুঝতে পারল, মুখ সাদা ফ্যাকাশে। ভয়ে চারু একটা কথা বলতে পারছে না।

বিজয় বলল, কোথায়। কোথায় সে! তুমি কি ভেবেছ!

চারু কিছু ভাবেনি। চারু বুঝতে পারছে তার দোষের শেষ নেই। কেন যে মরতে সে চুরি করে কিছু খাবার অথবা নুটু এলে দু এক দিন থেকে যাক আর্জি জানাতেই, পরে বিজয় অথবা তার বউ রাণী দু একদিন কেন, প্রায় একবার এক নাগাড়ে সাতদিন থাকার অনুমতি দিয়েছিল। রাণী তখন বার বার বুঝিয়েছে নুটুকে, আর আসবি না। মনে থাকবে তো। তখন নুটু ঘাড় কাত করে বাধ্য ছেলের মতো বলছে, আর আসব না। পুরস্কার হিসাবে খোকনের পুরানো জামা প্যাণ্ট পেয়েছে। মা তাকে বেলুন কিনে দিয়েছে। এবং নুটু একজন সামন্ত রাজার মতো আদেশ করেছে চারুকে, জিলিপি খাব মা। জিলিপি কিনে দিয়েছে। আমি রাধাবল্লভী খাব মা। চারু তাকে রাধাবল্লভী খাইয়েছে। বলেছে, মামীর সঙ্গে ভাল হয়ে থাকতে। এখানে আসা বারণ। এলে বাবুরা খুব রাগ করে।

নুটু বড় বড় চোখে তাকিয়েছে। সে কি করে বোঝাবে মাকে ছেড়ে তার থাকতে খুব কষ্ট হয়। মামী খেতে দেয় না। দূর দূর ছার ছার করে। কিন্তু সে একটা কথাও বলে নি।

তারপর আবার এলে নুটুকে কান মলে দিয়েছিল রাণী।

আর একবার নুটুকে বিজয় কান ধরে টানতে টানতে সদর রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। এবং সে বাড়ি ফিরে দেখেছে তার আগেই নুটু চারুর কাছে পৌঁছে গেছে। তারপর একবার বিজয় নুটুকে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে। যাক যেদিকে খুশি চলে যাক। পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখেছে ভাল মানুষটি হয়ে বসে আছে দরজার গোড়ায়। শেষবার বিজয় ভাবল ভাল ব্যবহার করে দেখা যাক—নতুন জামা প্যাণ্ট কিনে দিয়ে বলল, আবার বছর পার করে আসবি। আবার নতুন জামা প্যাণ্ট পাবি।

নুটু সেই যে গিয়েছিল আর বেশ মাস খানেক হল আসে নি।

বিজয় ভেবেছিল সত্যি সৎস্বভাবের হয়ে গেছে নুটু। মান সম্ভ্রমবোধ বেড়েছে। আর আসবে না।

বিজয় হুংকার দিয়ে উঠল, কোথায়! কোথায় সে!

রাণী বলেছে, বাজে বকিও না। মাথা ধরেছে। কেবল চেঁচাচ্ছে।

চারু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলছে না। ঘরে ফ্লোরোসেন্ট বাতি। রাণী একদম আলো সহ্য করতে পারছে না। পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

রাণী ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল, আলোটা আবার জ্বেলেছ কেন? নিভিয়ে দাও।

বিজয় এবার তিক্ততায় ফেটে পড়ছে। রাণীর গায়ে আজ আর হাতই রাখা যাবে না। অথচ আজ সে উৎফুল্ল হয়ে ভেবেছিল—সারা রাত রাণীকে সে কি যে সব করবে। রাণীর মুখে ভয়ংকর কঠিন সব রেখা। কখনও রিক্ততায় অথবা কখনও নিষ্কর্মা মানুষের হাতে পড়লে যা হয়—এমন ঘৃণায় যেন রাণী আর ওর দিকে তাকাবেই না। সে তারপর সারা ঘর কাঁপিয়ে বলল, তোমরা ভেবেছ কি! কেউ কিছু বলবে না। কোথায় শুয়োরের বাচ্চা। বলে সে প্রায় হুংকার ছেড়ে বের হয়ে পড়বে এমন সময়ে রাণীর কেমন হুঁশ ফিরে এল। মানুষটারও

মাথা ঠিক নেই। রেল ধর্মঘট চলছে। দাবী দাওয়া সরকার কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না। ধর্মঘট বানচাল হবার মুখে। তবু নিষ্কর্মা মানুষের গলায় পুরুষের হুংকার উঠেছে দেখে রাণী উঠে বসল। বলল, যাও দ্যাখোগে মোড়ে বোধ হয় আছে। পাশের বাড়ীর বউটি বলেছে, আমরা যখন বাড়ি থাকিনা, চারুর কাছে আসে। চারু জানালায় হাত বাড়িয়ে কিছু দেয়। কি দেয় যখন দেখিনি, তখনতো বলতে পারিনা ভাত রুটি দেয়। অথচ চারুর সামনে বলতে সাহস পাচ্ছিল না রাণী। চোরের দায়ে অভিযুক্ত করার সাহসও এ ক'মাসে চারু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। চারুও জানে সে না থাকলে এরা সবাই চোখে অন্ধকার দেখবে।

বিজয় বের হয়ে যাচ্ছিল।

রাণী বলল, একেবারে পার করে দিয়ে আসবে।

চারু বুঝতে পারল না সেটা কতদূরে।

চারু জানালায় দেখল একজন দৈত্য ছুটে যাচ্ছে।

চারু দেখল, একজন নাবালক হাত তুলে বলছে, না আমি।

বিজয় এত রাতে আমার বাড়ির পাশে টর্চ মারছে কেন। সে একবার এসে শুধু বলেছে, খুঁজছি। কেমন পাগলের মতো তার চোখ মুখ। সামান্য নুটু তার জীবনে কি এমন সমস্যা সৃষ্টি করেছে বুঝতে পাচ্ছিল না।

খুঁজছি। সে শীতের মাঠে টর্চ মারতে থাকল শুধু! ঠিক কোথাও অন্ধকারে শীতের মাঠে ঘাপটি মেরে আছে।

আর তখনই মনে হল ভাঙ্গা পাঁচিলের পাশে বসে কেউ কি খাচ্ছে। নুটু! নুটুর চোখ দুটো টর্চের আলোতে চক চক করছে। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল—সেই দৈত্যটা, নিজে সব খাবে, কাউকে কিছু দেবে না।

বিজয়ের মাথা ঠিক ছিল না। অন্ধকারেই দৌড়াল।

নুটু দৌড়োচ্ছে।

দু জনই বেশ এখন দৌড়বাজ হয়ে গেছে।

এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শীতের মাঠে তারা হারিয়ে গেল।

এখন কেবল কুয়াশা।

এই অসুস্থতার নাম কি আমি জানিনা।

এর নাম ব্যক্তি স্বাধীনতা কিনা জানিনা?

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের জন্য কতটা দরকার?

আমার সামনে হাজার লক্ষ মানুষ ভূতের মতো নৃত্য করছিল। আমি বুঝতে পারছি—পৃথিবীর গরীব মানুষের ওটা একটা ভুখা মিছিল।

আমার কাছে নুটুর জীবন ভীষণ রহস্যময় মনে হয়েছিল। ঠিক কুয়াশায় পথ হাঁটলে যেমন হয়। কোনটা ঠিক কোনা বেঠিক বুঝতে পারছি না।

নুটু কি শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছে?

বিজয় কি শেষ পর্যন্ত নুটুর নাগাল পেয়েছে?

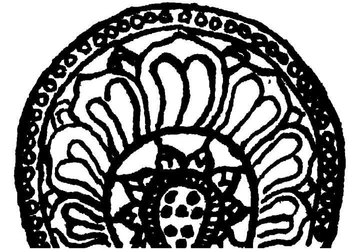
এরা কি কেউ কখনও সত্যিকারের নাগাল পায়?

জানালায় আমি একা। শীত করছিল।

একটি তালপাতার টুপি পরে এখন বোধ হয় পাঁচিলের ওপর দিয়ে নুটু দৌড়াচ্ছে। আর পাশে পাশে বিজয়। বিজয়ের জামা কাপড় খুলে পড়েছে সব। গায়ের লোম শক্ত হয়ে গেছে। সে উলঙ্গ। বিজয়কে একটা বড় রাক্ষসের মতো লাগছিল।

তারপরই বড় রাস্তায় চিৎকার কোলাহল। কোনো দুর্ঘটনা। লোকজন ছুটে যাচ্ছে। সেই ভুতুড়ে আকাশের নিচে কোনো অন্ধকার নেই। নিয়নের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল একটা তালপাতার টুপি। বাসের তলায় থেতলে গেছে। দুঃখী মানুষের এক জ্যান্ত ফসিল হয়ে গেছে নুটু। ভিড় বাড়ছে। মানুষেরা ছুটোছুটি লাগিয়েছে। বিজয় দেখছিল উবু হয়ে। যেন এক ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। অথবা কোনো পাথরে খোদাই করা ভূমিহীন মানুষের মুখ। হাতের মুঠিতে সামান্য রুটি গুড়। ভুতুড়ে আকাশের নিচে সে উঁচু করে ধরে রেখেছে। রুটি গুড় চুরি করে কে পালাচ্ছিল। বাসের চাকা ওর হাতের মুঠো বিনষ্ট করতে পারেনি। অবিকল, সেই শক্ত মুঠিতে কথাবার্তা ফুটে উঠেছে। সামান্য রুটি গুড়ের জন্য আপনারা বাবুরা এমন করেন!

চুপি চুপি ফিরে আসছিলাম। আততায়ীকে আমি চিনি। অথচ আঙ্গুল তুলে স্পষ্ট চিহ্নিত করার সাহস আমার নেই! গভীর নিশীথে কোনো দিন জেগে যাই—ভেতরে কে যেন তড়া করে, অথবা যেন কেউ ডাকে, বাবু আমি। আমাকে দেখুন। ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর। সরে যাই জানালা থেকে। শুনতে পাই তখন উদাসীন মাঠে কে যেন বেহালা বাজায়।



কৃষি সংবাদ

বেশী ফলন পেতে অধিক ফলনশীল ধান রোয়ার সময় কি করবেন ?

১। রোয়ার জন্য নীরোগ, সতেজ ও সবল চারা ব্যবহার করুন।

২। প্রয়োজনবোধে যৌথ বীজতলা থেকে চারা যোগাড় করুন।

৩। সবটা ফসফেট ও পটাশ সার এবং মোট নাইট্রোজেন সারের ভাগ জমি কাদা করার সময়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

৪। রোয়ার আগে কাদান জমি মই দিয়ে ভালভাবে সমান করুন। যাতে সমস্ত জমিতে জল সমানভাবে দাঁড়ায়।

৫। চারার ৪-৫টি পাতা হলে রোয়ার উপযুক্ত হয়। জলদি জাতের বেলায় তিন সপ্তাহ, মাঝারি জাতের বেলায় চার সপ্তাহ এবং নাবি জাতের বেলায় পাঁচ সপ্তাহের চারা রোয়া চলে।

৬। আট ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে ৪—৬ ইঞ্চি অন্তর ২—৩টি চারা লাগান। এন-সি ১২৮১ এবং ৪-সি ১৩৯৩ নাবি জাতে ৯ X ৯ ইঞ্চি দূরত্বে ৩— ৪টি চারা লাগান।

৭। চারা আলগাভাবে রুইবেন। দুই ইঞ্চির বেশী গভীরে চারা রুইবেন না।

রোয়ার ৮-১০ দিন বাদে ক্ষেত ঘুরে দেখে মরা চারার জায়গায় নতুন চারা বসিয়ে দিন।

বিশদ জানতে আপনার এলাকায় গ্রামসেবক বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের (এ-ই-ও) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

ঝাপান উৎসবে বিষ্ণুপুর



প্রশান্তকুমার রায়

গাইডকে সঙ্গে নিয়ে গড়দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। কত প্রাচীন অথচ কী বিশাল দৃষ্টি। মুসলমান স্থাপত্যের শিল্প নৈপুণ্য এখানে নেই। পোড়া মাটির নিদর্শনও নেই। এই স্বপ্নময়ী বিষ্ণুপুরের প্রধান দরজার সামনে দাঁড়ালে মনটাকে কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর কোন একটি বিশেষ যুগে। গাইড বললেন আসুন, আমার হাত ধরেই আসুন ঐ গড়দরজার মাথায়, দাঁড়িয়ে শুধু দেখবেন, চোখ মেলে দেখবেন, সারা বিষ্ণুপুর শহরকে; বিষ্ণুপুরের মন্দির-গুলির চূড়ো, দেখবেন রাজপ্রাসাদের কার্ণিশগুলিকে।

"মনে করুন, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমনই এক শ্রাবণ সংক্রান্তির প্রদোষ কালের পূর্ব মুহূর্তে বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদে এসেছেন ঝাপান উৎসব দেখতে। আপনার পাশেই দ্বাররক্ষী। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে ধুলো উড়িয়ে রাজা বীর হাম্বির আসছেন পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যের দুর্বল দস্যু সর্দারদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। দ্বাররক্ষী তা দেখে সংকেত দিতে থাকে। নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে গাইড গাইতে শুরু করলেন—

"গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাহুদ্যার মামা।
আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার
মত্ত ধানুকি কালসার।"

গানটি যদিও রণাঙ্গনে যাবার মুহূর্তের গান তবুও তাৎপর্য আছে। কারণ যে যে ভাবে গিয়েছিল সে সে ভাবেই ফিরেছে।

রাজ্যে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বীর হাম্বিরের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হল। সেনাপতি ঘোষণা করলেন সমবেত সকলের সামনে, "বিষ্ণুপুরের মহান রাজা বীর হাম্বিরের সম্মান রক্ষার্থে আজ শ্রাবণ সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে আগের বছরের ন্যায় এবছরেও মা-খল উৎসব উপলক্ষ্যে দেবী মা মনসার বন্দনা স্বরূপ বিষ্ণুপুরের লোক-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিদর্শন ঝাপান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপন আপন দলের সাপগুলিকে খেলা দেখিয়ে প্রতিটি দল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন এবং আমাদের মহান রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বিজয়ীর বরমাল্য গ্রহণ করবেন।"

নেমে এলাম ছাদ থেকে। রাজবাড়ীতে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। বাহির বারান্দায়, ছাদে, সব জায়গাতেই লোকের ভীড়। কখন ঝাপান দল আসবে। গরুর গাড়ীতে চেপে মাথায় সিঁদুরের বড় টিপ দিয়ে অল্প বয়সী এবং প্রৌঢ় দুজনকে দেখা গেল। ওদের সঙ্গে আসছে ঢাক, ঢোল ইত্যাদি। দেখে মনে হল বাগদী কিংবা কেওড়া জাতের লোক। সকলেই যেন ভাবে বিভোর। অল্পবয়সী যে জন হাতে ডমরু নিয়ে নিজের মনেই গান গেয়ে চলেছে, চোখের কোনে দুফোঁটা জল দেখলেও অতিরঞ্জিত করা হয় না, ওর নাম লক্কা। বয়স ত্রিশের মধ্যেই হবে। লক্কার বিয়েও হয়েছে অনেক দিন। রাত থাকতে জাল হাতে মাছ ধরা, দিনের বেলায় ঘর সংসার দেখা আর রাতের বেলায় বাগদীপাড়ায় গিয়ে আর পাঁচটা ছেলে ছোকরাদের নিয়ে হৈহুল্লোড় করা, তাড়ি খাওয়া ইত্যাদি চলে। এরা যে যাই করুক না কেন শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রাজবাড়ীতে ঝাপান উৎসব উপলক্ষে সাপ খেলা দেখানোর সময়ে কিন্তু ওরা সবাই মা মনসার পরম ভক্ত হয়ে যায়। লক্কা আপন মনে গান গেয়ে চলেছে বেহুলা লখিন্দরের জীবন কাহিনী। সাপের কামড়ে মৃত লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা চলেছে স্বর্গে, ভেলায় চেপে। কাহিনী অতি প্রাচীন, সকলেরই জানা কিন্তু লক্কাতো গাইয়ে নয় যে ওর গলায় এত করুণ রসের সঞ্চার হবে। ওদের গরুর গাড়ী তখন লালমাটির রাস্তা দিয়ে একপা একপা করে এগিয়ে চলেছে অজস্র ভীড় ঠেলে। আর লক্কার করুণ সুর দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে:—

"ওরে-ও-নিঠুর-কালিয়া-য়া-য়া,
মনসাকে তোরা দেখিলিনা।
ভাইরে-রে, বাসরেতে খেলি পতি
পুহাইলো সারা রাতি
এই কি ছিল রে মনের বাসনা-য়া।
আ-আমায় কেন খেলি না।
ওরে-ও-নিঠুর কালিয়া-য়া-য়া,
মনসাকে তোরা দেখিলি না।।"

দেখতে দেখতে আর একদল, তারপর আর একদল এসে উপস্থিত। ভীড়ও রীতিমত পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল। এবার গরুর গাড়ীগুলি একে একে দাঁড়ালো। সাপ খেলা দেখানো হবে। সাপের ঝাঁপির ঝুপড়ি খুলে জ্যান্ত সাপগুলিকে যে বার করছে, তার নাম হারান। বয়স ষাটের কোঠায়। ঝুপড়ি খুলে সাপগুলিকে বার করে হারান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। তারপর দু-একবার সাপের মাথায় টোকা মারতেই ওদের ফোঁস ফোঁসানি শুরু হয়ে যায়। উত্তেজিত হারান সাপটির

মুখ ফাঁক করে হাতের চেটোয় ধরিয়ে দেয়। বিষাক্ত সাপটি তখনই কামড়ে ধরে। দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে চেটো থেকে। হারানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝুপড়ি থেকে তারপর আরো দুটি সাপ বার করল হারান। তারমধ্যে একটিকে হাতের চেটোয় আর অপরটি নিজের জীব বার করে তাতেই কামড়াতে ধরিয়ে দেয়। জীব কামড়ে সাপটি রীতিমত ঝুলতে থাকে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সকলেই যখন চোখ নামিয়ে নিয়েছে হারান তখন দিব্বি মেজাজে খেলা দেখাচ্ছে। নজর পড়ল যখন ও দেখলো নিজের কাপড় চোপড় রক্ত মাখা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য যখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমি তখন লক্ষ্য করলাম অপর এক বৃদ্ধকে। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে ও। একটা পেতলের ঘটির বাইরে মুখগুজে ও মন্ত্র পড়ছিল। যাই হোক হারানের ঐ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ঘটির জল হারানের মুখে, হাতে স্পর্শ করিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়া বন্ধ।

হারানের খেলা দেখানো শেষ হতে না হতে এলো একটি মেয়ে। এই খেলাগুলি কিন্তু গরুর গাড়ীর ওপরেই দেখানো হচ্ছে। এবার যে মেয়েটি খেলা দেখাতে এসেছে ও হারানেরই মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। বাপ বললে, ওরে ও লক্ষ্মী, বার করতো মনসাটাকে, ওর আবার বড় তেজ। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী বার করলো ঝুপড়ি ফাঁক করে একটি জাত কেউটেকে। রাগে গজরাতে গজরাতে অভিমানী তেড়ে আসে। লক্ষ্মী ভয় পেলে হবে কি—ওর ধারণা যে মন্ত্রপুতঃ এ শরীরে সাপের বিষ লাগবেই না। খেলা দেখানোর সাথে সাথে লক্ষ্মী গান গাইতে শুরু করে:

"বিষ—বাম্দা—অমৃতকুণ্ডের বিষ
জল সারে বাট।
মহাদেবের আজ্ঞায় বিষ
কুণ্ডলী দিয়ে থাক।।"

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না, যুক্তি বা তর্কের আশ্রয় নিলে একে শ্রেফ বুজরুগি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না অর্থচ এই শ্রেণীর লোক যেমন বাগদী, মেটে, কেওড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো চূড়ান্ত বিশ্বাস সাপের কামড়ে আর ডাক্তার বদ্যির দরকার নেই, শ্রেফ মন্ত্র পড়লেই এর বিষ কাটানো যায়। আর তার জন্যই ঝাপানের আয়োজন। কে কত বড় গুণীন এখানেই দেখা যাবে। সঙ্গীরা একসময় আলাপ করিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক, বিদ্যোৎসাহী এক শিক্ষকের সঙ্গে। নাম মাণিক লাল সিংহ। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে।

উনিই জানালেন, ঝাপান দক্ষিণ রাঢ়ের মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর উৎসব। মৎস্যজীবীগোষ্ঠী বলতে যেমন ধরুন, বাগদি, মেটে, খয়ড়া, লায়েক ইত্যাদি জাতি। বহুপূর্বে এই গোষ্ঠীর লোকেরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করত। তারপর জীবিকার সন্ধানে এরা ক্রমশ বাংলাদেশের দিকে এগুতে থাকে। কাঁসাই নদীর দুই তীর সিজুয়া আর মাজুরিয়া গ্রামে এরা বসতি স্থাপন করে। তারপর ক্রমশ ব্যবসা বৃদ্ধির ফলে নতুন করে জীবিকার সন্ধানে এদের মধ্যে অনেকে দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে, এমনকি অজয় ও দামোদর নদীর ধারেও বসতি স্থাপন করে।

মৎস্যব্যবসায়ে এইসব গোষ্ঠীর লোকেদের সর্পাঘাতজনিত মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটত। যেহেতু সর্পদেবী হলেন মা মনসা তাই ঝাপান উৎসবের মাধ্যমে মনসা বন্দনা মল্লভূমে বহুকাল প্রচলিত হয়ে আসছে। মহারাজা বীর হাম্বিরের রাজত্বকালেই এই ঝাপান উৎসবের সূচনা।

স্থানীয় কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওরা বললে, এ উৎসবের আর কোন জৌলুসই নেই। বিষদাঁত ভেঙ্গে এরা সাপ খেলা দেখাতে নিয়ে আসে। এমন কি সাপের ছোবল খেয়ে বিষক্ষয় করতে ওরা খেলা দেখাতে আসে। কিন্তু মাণিকবাবুর ধারণা অন্যরকম।

তিনি বললেন, দেখুন, যখন ডাক্তার বদ্যির প্রচলন ছিল না তখন লোকে তো এই সব গুণীন শ্রেণীর ওপরেই বিশ্বাস রাখত বেশী এবং এও দেখা গেছে যে লোকে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিরাময়ও হয়েছে আশাতীতভাবে। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন এইসব মন্ত্র পড়া, মন্ত্রচালনার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ঠাকুরদাদার মুখেই শুনেছি একবার এই বিষ্ণুপুরেই থানার মধ্যে একটি বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। সাপটিকে ধরার জন্য যখন গুণীনকে নিয়ে আসা হয় তখন সেই গুণীন মন্ত্র পড়ে অনায়াসেই সাপটিকে ঝুপড়িতে পুরে রাখল। তখন থানার দারোগাবাবু গুণীনটিকে সাপ খেলা দেখানোর জন্যে অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু সাপটিকে বার করার মুহূর্তেই সাপের ছোবলে মৃতবৎ হয়ে পড়ে সেই গুণীন। আমার ঠাকুরদাদা ঘটনাটি আদ্যপান্ত দেখেছিলেন। তাই তিনি মন্ত্রপড়ে আর খড়ের বিড়ে এনে তাকে জ্বালিয়ে মৃতের সপাশে ঘুরতে থাকেন। ক্ষতস্থানে প্রজ্বলিত বিঁড়েটিকে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ও আরোগ্যলাভ করে।

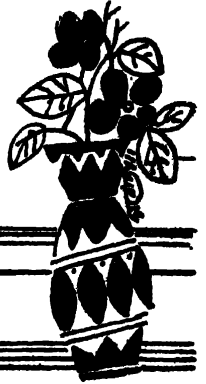
'আচ্ছা, হঠাৎ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনেই বা এই ঝাপান উৎসব পালন করা হল কেন?'

মাণিকবাবু বললেন, "আমাদের মল্ল-ভূমে অধিকাংশ উৎসবই তিথি ধরে। আবার অনেকগুলি বিশেষ দিন ধরে। যেমন, শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে ঝাপান উৎসব, কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিনে কার্ত্তিক দেবতার পুজো, চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাজন, মকর সংক্রান্তির দিনে মকরের পুজো ইত্যাদি। তবে এই চারিটি দেবদেবীর আরাধনার পেছনে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন এইসব দেবদেবীর উপাসনার অর্থই হল জমির উর্বরতা এবং বংশবৃদ্ধি। দেখেননি, আমাদের দেশের বিবাহিতা মেয়েরা রাত্রে সাপের স্বপ্ন দেখলে বলে সন্তান হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং মল্লভূমে সর্পদেবীর অর্থাৎ মা মনসার পুজো মানেই হল বংশবৃদ্ধি এবং জমির উর্বরতা। ঝাপানের অর্থ চতুর্দোলা। চতুর্দোলায় চেপে গুণীনরা খেলা দেখাতে আসে। চতুর্দোলায় বসেই ওরা ঝুপড়ি ফাঁক করে সাপ বার করে।"

দলমাদল কামান আজ নিস্তব্ধ, শক্তির পূজারী বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বিরের রাজত্ব এখন ঐতিহাসিক স্মৃতির ভগ্নস্তূপে বিরাজ করছে। কিন্তু তার সংস্কৃতি, তার উৎসব, তার গান, তার আচার বিচার, বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে ঝাপান উৎসব না দেখলে বোঝা যাবে না।

ঘর সাজানো : অল্প খরচে

দুর্গা বসু



আজকের দিনে ঘর সাজানো বা ইন্‌টিরিওর ডেকরেশান যেন প্রত্যেক পরিবারে সামাজিকতার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে আর নিজের পরিবেশকে সাজানোর নেশা মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে। প্রমাণ প্রাগৈতিহাসিক শিলাচিত্র আর দেওয়াল অঙ্কন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো থেকে অজন্তা, ইলোরা সবই সেই একই সাক্ষ্য বহন করছে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারেও আজ চল হয়েছে ঘর সাজানোর। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে—এ সম্বন্ধে বাংলায় বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য বই পাওয়া যায় না। ইংরেজী যা দু'চার খানা মেলে, ভাষার অন্তরায় ছাড়াও তার বেশীর ভাগের দাম মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে। তাই অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারেই ইন্‌টিরিওর ডেকরেশান সম্বন্ধে একটা ভয় আছে যে ওটা হচ্ছে একটা বিরাট খরচের ব্যাপার, শুধু বড়-লোকদেরই ওতে এক্তিয়ার; যাঁরা মোটা ফি দিয়ে ডাকতে পারেন ইন্‌টিরিওর ডিজাইনারদের: কথায় কথায় বাতিল করতে পারেন বাড়ীর সমস্ত ফার্নিচার কিম্বা তাবৎ পর্দা-চাদর-সুজনী-ওয়াড়-কুশন-কার্পেট।

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। ঘর সাজানোর সঙ্গে রুচির যতটা সম্পর্ক, খরচের সম্পর্ক তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। রুচির খাতিরে খুব কম খরচেই তারিফ করার মত করে ঘর সাজানো চলে। খরচ আরো কমবে যদি সেই ঘর সাজানোয় পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ না করে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে বেছে নেওয়া যায়। যেমন সোফাসেটের বদলে জলচৌকি, পিঁড়ি, ডানলোপিলো কুশনের বদলে তুলোর কাজ করা তাকিয়া, কার্পেটের বদলে আলপনা আর 'রঙ্গোলীর' প্রয়োগ করে। এই শিল্পী সুলভ বৈচিত্র শুধু যে খরচ কমাবে তাই নয়, আপনার অতিথির মনেও চমক্ লাগাবে। খরচ আরো কমবে যদি এর কিছু কাজে নিজের হাত লাগান। প্রত্যেক পরিবারেই দেখা যায় কতকগুলো গুণের সমাবেশ। বড়দা ফটো তোলেন, ন'দা পারেন ছবি আঁকতে, সেজদি এব্রয়ডারীর ওস্তাদ, দিদিভাই-এর নেশা বাটিকের কাজ কিম্বা ফেব্রিক পেনটিং, ছোট খুকির আলপনা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, মেজ কাকু পারেন কাগজের ফুল তৈরী বা অরিওগ্যামি, জেঠু কলেজে পড়তে ক্লে মডেলিংএ হাত পাকিয়েছিলেন —এমনি কত কি! কার্ডবোর্ডের মডেল তৈরী, পুতুল বানানো, পুঁথির কাজ, খই দিয়ে গাছ সাজানো, দেওয়ালে রঙ্গীন চকের নকসা, বাগান করা, রঙ্গীন মাছের চাষ, নকসী-কাঁথা তৈরী, চামড়ার কাজ, বেতের কাজ এমন কি লেস বোনার বিদ্যাকেও সুন্দর ভাবে ঘর সাজানোর কাজে লাগানো যায় একটু মাথা খাটালেই। এতে খরচও কম হবে, সৃষ্টির আনন্দও পাবেন অসীম।

ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব রাখবেন না। আজকালকার ঘর, বিশেষ করে ফ্ল্যাটের ঘর সাইজে ছোট। বাড়তি ফার্নিচারের চাপে তা যে শুধু জবড়জঙ্গই দেখাবে তা নয়: আপাত দৃষ্টিতে আরো ছোট দেখাবে। মনে আসবে একটা দমবন্ধ করা চাপা ভাব। আলনা এমন একটা আসবাব যার মধ্যে কোন শ্রী আর শৃঙ্খলা আনা শক্ত। পর্দা বা ছোট আলমারী দিয়ে একে রাখুন দৃষ্টির আড়াল। এই আড়ালটুকু শ্রীমতীর কাপড় বদলানোরও কাজে লাগবে।

কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে সাবেকি আমলের খাট-পালঙ্ক, চেয়ার টেবিলের অলঙ্করণ বা মোটিফগুলো খুলিয়ে নিন বা সেগুন পাই দিয়ে ঢাকিয়ে নিন। চেহারা ছিমছাম হবে, ধূলো ময়লা জমবে কম, ঝাড়া মোছাও সহজ হবে। টার্নিং করা পায়ার অলঙ্করণ ঢাকা শক্ত। প্রয়োজন বোধ করলে পুরানো পায়া কাটিয়ে, আধুনিক 'ট্যাপারিং' পায়া লাগিয়ে নিন। লোহার (স্কোয়ার বার) চৌক পায়াও লাগাতে পারেন।

এবার পালিশ। ঘর সাজাতে হলে ঘরের সব আসবাবের মধ্যে একটা সমতা বা 'ম্যাচ' আনতে হবে। সেগুন কাঠের পালিশ করা টেবিলের সঙ্গে বেতের বা পলিয়েষ্টারিন চেয়ার বেমানান। পলিয়েষ্টারিন চেয়ার থাকলে টেবিলের ওপরটা সেই রংএর ল্যামিনেট প্লাষ্টিক (যেমন ফরমাইকা বা সানমাইকা) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অর্থাৎ শুধু ডিজাইনের সমতা নয়, রং বা পালিশেরও সমতা আনতে হবে। যদি তেল রংএর স্কীম করতে চান—একই শেড ও ব্র্যাণ্ডের সিনথেটিক এনামেল ব্যবহার করুন। যদি চান পালিশ করতে, নজর রাখতে হবে পালিশের রং আর গাছের ওপর।

কেবল সুষ্ঠু রং-এর নির্বাচনেই ঘরের ভোল একেবারে পাল্টে দেওয়া সম্ভব। কোন রং-এর সঙ্গে কোন রং মানাবে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। ঘরে কতটা আলো কোন দিক দিয়ে

আসে তার উপরেও খানিকটা নির্ভর করে রং-এর নির্বাচন। এছাড়া শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর বা পড়ার ঘর—ঘরের ব্যবহার হিসাবেও রং-এর অদল বদল হয়। এক একটা রং যেমন নীল শুধু ছায়াতে ব্যবহার করা চলে। সরাসরি রোদ পড়লে এ রং জ্বলে বিবর্ণ হয়ে যাবে। সবদিক বিচার করে রং নির্বাচন করলে তবেই তার যাদুকরী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রামধনুর তাবৎ রংকে দুভাগে ভাগ করা যায়—চড়া রং (যেমন লাল, হলদে, কমলা, গাঢ় গোলাপী) আর ঠাণ্ডা রং (যেমন নীল, সবুজ, মভ, ফ্যাকাশে গোলাপী)। এছাড়া আর এক ভাবেও ভাগ করা যায়, 'শেড' হিসাবে। যে কোন রং এর ফিকে বা গাঢ় শেড হতে পারে।

(ক) চড়া রং মনে স্ফূর্তি আনে। লাল রং মানুষের কর্ম স্পৃহা বাড়ায়। হলদে প্রাণে আনে খুশীর জোয়ার। কমলা রং উদ্দীপক। এদের বলা চলে 'কাজের রং'।

(খ) ঠাণ্ডা রং মানুষকে শান্ত ও সজীব করে। নীল আর কচিকলাপাতা রং শ্রান্ত মনকে সজীব করে তোলে। আকাশী রং বা মুক্তোর রং প্রশান্তি আনে। গাঢ় সবুজ বা গাঢ় নীল ঘুমের সহায়ক। এদের বলা চলে 'বিশ্রামের রং'।

(গ) গাঢ় শেডে ঘর ছোট দেখায়। পুরানো আমলের প্রকাণ্ড ঘর বা খুব উঁচু ছাদ থাকলে—দূরের দেওয়ালে বা সিলিংএ গাঢ় রং ব্যবহার করা হয়—ঘর আনুপাতিক ভাবে ছোট দেখাতে।

(ঘ) ফিকে শেডে ঘর বড় দেখায়। ফ্ল্যাটের ছোট ঘরে ফিকে শেড ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

এছাড়া হলুদ, সাদা, গোলাপী প্রভৃতি রং ব্যবহার করলে ঘরে আলো বেড়ে যায়। অন্ধকার ঘর যেখানে সূর্যের আলো বিশেষ ঢুকতে পায় না বা কড়িডোর কিম্বা সিঁড়ি যেখানে আলোর অপ্রতুলতায় দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব সেখানে এই সব রং দেওয়া উচিত।

আলোচনা শেষ করার আগে ঘর সাজানোর দুটি স্কীম দেব। বসার ও শোবার ঘরের জন্য। নিজের প্রয়োজন মত ঈষৎ অদল বদল করে ঘর সাজাতে লেগে যান। শেষ হলে দেখবেন খরচ হয়েছে অল্প কিন্তু লোকে তারিফ করছে বহুৎ।

বসবার ঘর :

বসবার ব্যবস্থা সোফাতেই হোক বা ফরাসেই হোক—পেছনদিকের দেওয়ালটি (এই দেওয়ালে জানালা না থাকাই বাঞ্ছনীয়) এবং সিলিং (সিলিং এ ফ্যান থাকলে সেটিকে একই রং করবেন) হালকা গেরুয়া রং করুন। বাকি তিনটি দেওয়াল থাকবে সাদা। পর্দা, কুশন, তাকিয়া, সোফা বা ফরাসের কাপড় বাদামী রং হোক। তাতে বা প্রিন্ট সুতোর কাজ থাকলে তা সাদা ও ব্রাউন মেশানো হওয়া উচিত। পেলমেট ও ফার্নিচারের কাঠের অংশগুলি হবে পালিশ করা 'ট্যান', 'ব্রাউন' বা চকোলেট রং এর। গেরুয়া দেওয়ালের উপর একটি বড় (২ ফুট × ৪ ফুট) সাইজের পেণ্টিং থাকবে সাদা ফ্রেমে। লক্ষ্য করে কিনবেন বা আঁকাবেন পেণ্টিংটি যাতে খয়রী ও সবুজ রং-এর আধিক্য থাকে। অল্প হলদে ও লাল রংও থাকতে পারে। পেণ্টিং এর বদলে যদি ফটোগ্রাফ টাঙ্গাতে চান, বেছে নিন তিন চার খানা ল্যাণ্ডস্কেপ কোন বিলিতী দামী পুরোনো বড় ক্যালেণ্ডার থেকে। গেরুয়া দেওয়ালে টাঙ্গাবেন সরু সাদা ফ্রেমে বাঁধিয়ে।

ফরাস থাকলে, যাতে দেওয়ালে মাথার তেল না লাগে, আড়াই ফুট চওড়া করে শীতল পাটি বা মাদুর কেটে আড়া আড়ি ভাবে দেওয়ালে আটকে দিন পাতলা কাঠের বিড দিয়ে চেপে। ইচ্ছে করলে গেরুয়া রংএর বদলে পুরো দেওয়াল জুড়ে শীতল পাটির প্যানেল লাগিয়ে, সুতো দিয়ে তা থেকে ঝুলিয়ে দিন হরেক রকম পুতুল। এক্ষেত্রে দুপাশের দেওয়াল গেরুয়া রং করতে পারেন। সামনের দেওয়াল আর সিলিং থাকবে সাদা। দরজা ও জানালা সাদা হওয়া উচিত। গ্রীল গেরুয়া। কার্পেট যদি পাতেন তার রং হবে গাঢ় কালচে লাল। ঘরের এক কোণে একটি সাদা নক্সা আঁকা ব্রাউন টবে লাগান লতানো মানি প্ল্যান্ট। বাজী রেখে বলতে পারি অতিথিদের তারিফে আপনার মন ভরে উঠবেই।

শোবার ঘর :

খাটের যেদিকে মাথা (এই দেওয়ালে জানালা না থাকাই বাঞ্ছনীয়) সেই দেওয়াল ও সিলিং করুন মাঝারী শেডের নীল। বাকি তিনটি দেওয়াল খুব ফিকে নীল। ঘরের আসবাব যদি রং করা হয় তবে তাও করুন নীল-মাঝারী শেডে। আর পালিশ করা হলে, মিস্ত্রিকে বলুন—যতটা সম্ভব সাদা করে পালিশ করতে। পর্দা, বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকা, ড্রেসিং টেবিলের কভার, গালচে ও টেবিল ল্যাম্পের শেড হবে গাঢ় নীল। মাথার দেওয়ালে ঝোলানো থাকবে একটা পেণ্টিং যাতে নীল, সবুজ আর কালো রং-এর আধিক্য। জ্যোৎস্না রাতের ল্যাণ্ডস্কেপ পাওয়া যায় কিনতে। তাই লাগান, রং-এর সামঞ্জস্য আপনি হয়ে যাবে। ফ্রেম অবশ্যই সরু ও সাদা। ফটোগ্রাফ টাঙাতে হলে রঙ্গীন সমুদ্রের দৃশ্য বা সী-স্কেপ টাঙ্গান। ঘরের এক কোনে নীল চাদরে ঢাকা ট্যাণ্ডে একটা সাদা মার্বেলের ট্যাচু রাখুন। এ ঘরে দু দণ্ড কাটালে মন শান্ত ও সজীব হয়ে উঠবে। ঘরের মানুষটি দেখবেন ঘর ছেড়ে বেরুতেই চাইছেন না।



খাদ্যের অপ্রচলিত উৎস সন্ধানে

নিশীথ চৌধুরী

অসুখ সারানো কঠিন কাজ না খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সহজ? অতি সহজে এই রকম একটা প্রশ্নের উত্তর নাও পেতে পারি, কিন্তু বাস্তব বলে যে—ক্ষুধিতের সংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে তাদের অন্নদান করা অনেক দুরূহ। ভেষজ শিল্পের উন্নতি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির হাওয়া পালে লাগিয়ে আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়ে চলেছে, মৃত্যুর হারকে বিপুল বিক্রমে হারিয়ে দিয়ে। বিশ্বের চারশ কোটি লোক সংখ্যা দু হাজার খৃষ্টাব্দে সাতশ কোটিতে দাঁড়াবে বলে অনেকেই মনে করেন।

খাদ্য উৎপাদন ও ক্ষুধার্তের সংখ্যার মধ্যে ফারাক বিস্তর। বিশেষ করে খাদ্যের আমিষ জাতীয় উপাদান (প্রোটিন)-এর অভাব সারা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO)-র বিবরণীতে জানা যায় যে সাধারণভাবে একজন সুস্থ স্বাভাবিক সক্ষম ব্যক্তির দৈনিক আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হলো ৪১ গ্রাম। অদূর ভবিষ্যতে বর্ধিত জন-সংখ্যার জন্য প্রোটিনের সঙ্কুলান করতে হলে গড়ে প্রতিবছর ৩৫ মিলিয়ান মেট্রিক টন আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু খুব বেশী করেও বছরে মাত্র ১৫ মিলিয়ান মেট্রিক টন প্রোটিন খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এখনই পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক মানুষই প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছেন। ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমিষ খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি না পেলে বিশ্ব-অপুষ্টির মাত্রাটা কোথায় পৌঁছাবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। তাই অপ্রচলিত উৎস থেকে আমিষ জাতীয় খাবার তৈরীর চেষ্টা সব দেশেই চলেছে।

আমাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদ জগৎ। সাধারণত প্রোটিন অণুর কাঠামোতে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন প্রভৃতি মৌল থাকতেই হবে, উপরন্তু সালফার, ফসফরাস প্রভৃতিও থাকতে পারে। আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে একান্তভাবে দরকার হয় আটটি অ্যামাইনো এসিডের। এই সব উপাদান হল নাইট্রোজেনের জটিল যৌগ বিশেষ। মানব দেহ এদের তৈরী করে নিতে পারে না, তাই নির্ভর করতে হয় অন্যের সরবরাহের উপর। প্রাণীজ প্রোটিন আবার সেই দিক দিয়ে বেশী উপযোগী, কেন না উদ্ভিদ প্রোটিনের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডগুলোর সব কটা পরিমাণ মতো থাকে না। ডিম, দুধ বা মাংসের মধ্যে লাইসিন, মেথিওনাইন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো থাকে যথেষ্ট পরিমাণে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং কিছু শীতপ্রধান রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সব দেশের প্রধানত উদ্ভিদ প্রোটিনই প্রধান ভরসা। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা উনসত্তর ভাগ প্রোটিন যোগায় গৃহপালিত গবাদি পশুপাখীরা। গরম আবহাওয়ার গরীব দেশগুলোতে সেখানে সত্তর শতাংশ প্রোটিন সংগৃহীত হয় উদ্ভিদ জগৎ থেকে। দু ধরনের প্রোটিন সরবরাহের শতাংশ মাত্রাগুলো কাছাকাছি হলেও গুণগত উৎকর্ষে তাদের পার্থক্য আছে অনেক। শরীর ঠিক মতো বেড়ে উঠতে লাইসিনের প্রয়োজন অত্যধিক। ডিমের মধ্যে লাইসিনের মাত্রাকে ১০০ ধরলে গমের ভিতর এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ, যবের মধ্যে ৪৪ শতাংশ, ভুট্টাতে থাকে ৩৮ শতাংশ। অবশ্য সোয়াবীনের মধ্যে লাইসিন থাকে ডিমের তুলনায় ১১১ শতাংশ। কিন্তু মেথিওনাইনের পরিমাণে ঘাটতি দেখা যায় সোয়াবীনে। সোয়াবীনের সংগে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী মিশিয়ে প্রোটিনের চাহিদা মেটানো চলে।

প্রাণী জগতের প্রোটিন সরবরাহের মূল ভাণ্ডার হলো উদ্ভিদ জগৎ। উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটির রস, নাইট্রোজেন প্রভৃতিকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। এই উদ্ভিজ প্রোটিন ভক্ষণ করে যে সব প্রাণী বাঁচে তাদের আবার মাংসাশী জীব আহার করে 'প্রোটিন'-ক্ষুধা মেটায়। হিসেব থেকে দেখা যাবে যে এক কিলোগ্রাম গৃহপালিত গবাদি পশুর মাংস আহরণ করতে হলে পশুখাদ্যে প্রায় চার কিলোগ্রাম উদ্ভিজ প্রোটিনের দরকার হয়।

সারা বিশ্বে কৃষির উপযোগী জমি মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। শতকরা ২২ ভাগ জমি কাজে লাগে গোচারণ ক্ষেত্ররূপে আর ৩০ শতাংশ মতো স্থান বনানী পরিবৃত হয়ে আছে। বাকী ৩৭ শতাংশ প্রায় জমি হয় খুব শুষ্ক আর নয়তো উঁচু জায়গায় তুষার মণ্ডিত হয়ে আছে। কর্ষণযোগ্য জমি এবং গোচারণ ক্ষেত্র এমন পর্যায়ে এসেছে যে তার থেকে বেশী সুবিধে পাওয়া যাবে না, আবার অকৃষি জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তুলতেও আয়ত্তের বাইরে খরচ পড়ে যাবে।

সুতরাং গৃহপালিত গবাদি পশুর খাদ্যের এবং মানবকুলের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা কি করে মেটানো যায়—তার উপায় খুঁজতে গিয়ে অপ্রচলিত উৎস থেকে আমিষ খাবার আহরণের চেষ্টা চলেছে সারা জগৎ জুড়ে।

একাধিক অ্যামাইনো এসিড অণুযুক্ত হয়ে জটিল প্রোটিন অণু গঠন করে। এক এক ধরনের প্রোটিনের ধর্ম নির্ভর করে থাকে তাদের উপাদান অ্যামাইনো এসিডে এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগের রীতি প্রকৃতির উপর। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের প্রয়োজন মেটাতে আমরা প্রাণীজ প্রোটিন আহরণ করি। এই সব জটিল প্রোটিন অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার এক বিশেষ পদ্ধতি—আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে ভেঙ্গে যায়। তৈরী হয় অ্যামাইনো এসিডের ছোট ছোট অণু। পালাক্রমে এগুলোই আবার দরকার মতো একত্রিত হয়, শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সৃষ্টি করে এবং পুরানোর জায়গায় নতুন জীবকোষ তৈরী করতে সাহায্য করে।

কলেরা, টাইফয়েড বা পেটের ব্যামো হলে আমরা এক কথায় অতি ক্ষুদ্র বীজানুদের দায়ী করি, খাবার শেষে পাতের উপাদেয় দই তাও জমে এক রকম বীজানুর সাহায্যেই। জমির উর্বরতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে বিভিন্ন বীজানুকুল। বীজানুরা খুবই ছোট আকারের, এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের একভাগ মতো হয়ে থাকে। এক ধরনের বীজানু আছে যারা সেলুলোজ থেকে কার্বণ সংগ্রহ করে নিজেদের দল বাড়ায় আর প্রোটিন উৎপাদন করে চলে। ঈষ্ট, ছত্রাক প্রভৃতি এককোষী ও বিশেষ অবস্থায় অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন তৈরীর সাথে সাথেই বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। আবার বিশেষ বিশেষ প্রকারের এক কোষী সজীব বস্তু খনিজ তেলের অণুর বিশ্লেষণ থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করেও প্রোটিন সংশেষণ করে থাকে। এই সব 'এক কোষী প্রোটিন' (Single Cell Protein) সেলুলোজ অথবা খনিজ তেলের মাধ্যম থেকে 'সেন্ট্রিফিউজ' করে সংগ্রহ করা হয়। তখন এগুলো থেকে পশুখাদ্য অথবা মানুষের খাবারের প্রোটিন-চাহিদা পূরণ হতে পারে।

গাছপালার অন্তর্গঠনে উদ্ভিদ কোষের রাজ্য, তার সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলে সেলুলোজ। সেলুলোজ হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ জটিল যৌগ বিশেষ। এর দ্রবণের থেকে ঈষ্ট অথবা উপযুক্ত এক কোষী জীব বিশেষ বিশেষ উৎসেচক (Enzyme) সৃষ্টি করে, বিক্রিয়ার ফলে সেলুলোজ অণু ভেঙে যায়। শর্করা জাতীয় পদার্থ হয় তার ফলশ্রুতি। ঈষ্ট বা ঐ ধরনের এক কোষী জীব শর্করা খাদ্যের মধ্যে খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি ঘটায়। পরিমাণ মতো নির্মল বাতাস চালনা করলে এখান থেকে নাইট্রোজেন, পটাশ প্রভৃতি সারের উপস্থিতিতে সেলুলোজ দ্রবণ থেকে খুব সহজেই এক কোষী জীব কোষ তথা প্রোটিন জন্মাতে থাকে। এদের আলাদা করে, ধুয়ে শুকিয়ে নিলে একটা বাদামী রংয়ের গুঁড়ো পাওয়া যায় যার ভিতর প্রোটিন আছে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ। লাইমিন, মেথিওনাইন এর মতো অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডের মাত্রা থাকে এর মধ্যে সোয়াবীনের চেয়ে বেশী।

এই প্রোটিনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সুগন্ধিদ্রব্য মিশিয়ে নানা রকমের খাবার বানানো হয়—চকোলেট, সুপ আর নয়তো আইসক্রীম, যা কিছু হতে পারে। গবাদি পশুখাদ্যে অথবা পোলট্রির খাবারের প্রোটিন সমৃদ্ধির জন্যও এর ব্যবহার আছে।

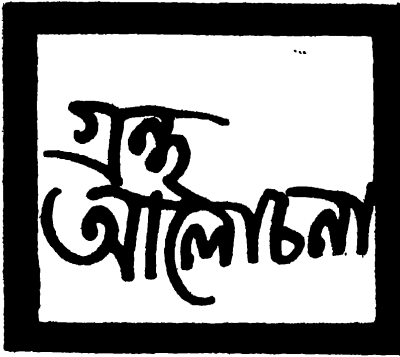
সেলুলোজ থেকে প্রোটিন তৈরী করবার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত উৎসেচক (Enzyme) প্রস্তুত করবার কারিগরীতে ভারতবর্ষও এগিয়ে চলেছে। বোম্বাইয়ের Cotton Textile Research Institute 'পেনিসিলিয়াম ফ্যুনিকুলাম' থেকে উৎসেচক আহরণের গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কৃষি গবেষণা পর্ষদ তত্ত্বাবধান এবং আর্থিক আনুকূল্য প্রসারিত করেছেন এই প্রকল্পে। এঁদের প্রচেষ্টায় কাঠের গুঁড়ো, আখের ছিবড়া; সুতোর পরিত্যক্ত অংশ বিশেষ, পাটকাঠির মণ্ড, অব্যবহৃত কাগজ, ভুষি প্রভৃতি সহজলভ্য জিনিসকে কাজে লাগিয়ে আমিষ উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাঠের গুঁড়ো থেকে আমিষ খাদ্য উৎপাদনের উপায় ঠিক করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থাও এবিষয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

অপ্রচলিত উৎস থেকে প্রোটিন তৈরীর অন্য এক পদ্ধতিতে খনিজ তেলের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খনিজ তেল কাঁচা মাল হিসেবে কাজ করে, এই কাজ করায় আবার সেই বীজানুর দল। তৈল শোধনাগার, তৈলবাহী জলযান অথবা স্থলযান খালাসের মঞ্চ অথবা তৈল খনি অঞ্চলের আশপাশের মাটি থেকে বিশেষ ধরনের এক কোষী জীবের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা খনিজ তেলের থেকে কার্বন নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ অ্যামাইনো এসিড, প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি তৈরী করতে পারে। এইসব এক কোষী প্রোটিনের থেকেও আমিষ খাদ্যের সরবরাহ বাড়ানো যায়।

প্রকৃতিতে যে খনিজ তেল পাওয়া যায় তা হ'ল পাঁচমেশালি এক জটিল জিনিস। প্রয়োজনীয় পেট্রল, কেরোসিন, মবিল তেল, গ্রীজ প্রভৃতি পাওয়া যায় এই খনিজ তেল থেকেই। তার জন্য অবশ্য অবিশুদ্ধ খনিজ তেলের বিশোধন দরকার, তা করা হয় 'তৈল-বিশোধন' কেন্দ্রে। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় খনিজ প্রাকৃতিক তেলের নানান উপাদান পাতিত করে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে কেরোসিন এবং মবিল তেলের মাঝামাঝি অবস্থায় পাওয়া যায় 'গ্যাস অয়েল' (Gas Oil)।

গ্যাস অয়েল জলের সংগে মিশিয়ে রাখা থাকে একটা বিক্রিয়া কক্ষে। এই মিশ্রণকে খুব দ্রুত আলোড়িত করা

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন



পঞ্চশর। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর। কলকাতা-১২ দাম : তিন টাকা।

পাঁচজন তরুণতর কবির মিলিত কণ্ঠস্বর 'পঞ্চশর'। কবিদের মধ্যে আছেন কমল চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, অরণি বসু ও শ্যামলকান্তি দাশ।

কমল চক্রবর্তীর মোট যে ন'টি কবিতা 'পঞ্চশরে' বেছে নেওয়া হয়েছে, বলাবাহুল্য, তার মূল সেই আদিবাসী পটভূমি, মানসিকতায় এক অন্যতর স্বাদ, পাঠকের মনে চকিত চমক আনে। শব্দচয়নে প্রতীকের ব্যবহারে কবির দুরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস পাঠক লক্ষ্য করবেন, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্তপনার জন্য তার প্রকাশ হৃদয়কে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু ছন্দদোলায় এবং অন্যতর ভাব-ভাবনায় 'ডুলং' স্মরণীয়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকপত্রে মোটামুটি পরিচিত নাম। তার একটি দীর্ঘ কবিতা 'সন্ধিসময়' বর্তমান সংকলনে সংগ্রথিত হয়েছে। আত্মমগ্নতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা 'সন্ধিসময়ের' কাব্যিক অবয়বে পাঠক আবিষ্কার করবেন।

বর্তমান সংকলনে মোট এগারোটি কবিতা আছে শংকর চক্রবর্তীর। ভাবনায় কবি অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ। কুয়াশার মধ্যে চোখ মেলেননি তিনি; রৌদ্রের সংসারে চোখের আলোয় অনুভব করেছেন জীবনকে, যন্ত্রণাকে। কবি বিষয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য অস্থির নন।

পরবর্তী কবি অরণি বসু সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য 'মনের গূঢ় রহস্য উন্মোচনের গভীর সাধনায় ব্যাপৃত অরণি বসুর কবিতা এক স্বতন্ত্র ভাবনার অবকাশ আনে, তাঁর কবিতা সারল্যের আবরণে প্রকৃতই টেনে নিয়ে যায় অসীম গাঢ়তার দিকে' ইত্যাদি কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বলেই মনে হতে পারে। সারল্যের আবরণ কি জিনিষ পাঠককে সেকথা ভেবে কিছুটা ভাবনায় পড়তে হয়। অরণি বসুর বাচনরীতি অনেকাংশে ঋজু, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোথাও কোথাও জড়তা লক্ষ্য করা যায়।

সর্বশেষ, শ্যামলকান্তি দাশ অপেক্ষাকৃত পরিচিত নাম। 'মেজাজে অদ্ভুত এলোমেলো, অগোছালো অথচ এলোপাথারি গ্রামীণ শব্দের নির্ভুল ব্যবহারে পারঙ্গম' শ্যামলকান্তি দাশ বর্তমান সংকলনে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিকে মাঝে মাঝে বেশ দৃঢ়বিশ্বস্ত মনে হয়েছে। শ্যামলকান্তির 'উত্তরাধিকার', 'উড়িয়ে দেবার বাসনা', 'জাগরণ', 'গাথা' ইত্যাদি অন্যতর ভাবনায় পাঠককে প্রভাবিত করে।

সুদূর মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত বর্তমান কাব্য সংকলন 'পঞ্চশর'-এর মুদ্রণ-পরিসজ্জা পরিচ্ছন্ন। তবে ছড়িয়ে থাকা কিঞ্চিৎ মুদ্রণপ্রমাদ পাঠকের ক্লান্তির কারণ হতে পারে। সংকলনের নাম 'পঞ্চশর' কেন, পাঁচ কবির কবিতার সংকলন বলেই নাকি। নামকরণ হিসেবে পঞ্চস্বর কি আরো অর্থবহ হতো না?

ইন্দ্রনীল সেন

নতুন গল্প। সুব্রত নিয়োগী, সমীর কান্তি বিশ্বাস। নতুন গল্প প্রকাশ, কলিকাতা-৭০০০২৭। এক টাকা

যাঁরা গল্প পড়তে চান, সংস্কৃতিসম্পন্ন তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুই গল্পকারের মোট চারটি গল্পের সংকলন। সুব্রত নিয়োগীর দুটি স্থলপদ্ম/হনন কাহিনী, সমীর কান্তি বিশ্বাস এর দুটি—ভয়/অন্যরকম কথামালা।

বলরাম বসাক ও সুধাংশুর মুখোপাধ্যায় নতুন আঙ্গিকে লিখিত লেখক পরিচিতি বর্ণনের রীতিটি গল্পগ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ। সুব্রত নিয়োগী সম্পর্কে বলরাম বসাকের মন্তব্য—শ্রী নিয়োগী নতুন গল্পলেখার জন্য কখনই বিদেশীয় বা বিজাতীয় নীতি গ্রহণ করেন নি। ... তার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের সংস্কার সুপ্তবীজের আকারে আছে। সেজন্যে গল্পকারের স্বতোৎসারিত আবেগ। নিজের মতন করে গুছিয়ে বলার কায়দা—গল্প দুটিকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

উগ্র আধুনিকতার অবলম্বনই দুটি গল্পে পরিস্ফুট। দেহবাদের পুংখানুপুংখ বর্ণনা ও যৌনচেতনার অত্যাধুনিক প্রবণতা লেখক সযত্নে আয়ত্ত করেছেন। তবে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ্য—তাহ'ল গল্পের শেষে দার্শনিক দ্যোতনা, ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনদর্শনের অপূর্ব বিশ্লেষণ। এই জীবনদর্শন প্রকাশে বাক্‌সংযমের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারলে এ ধরণের গল্প প্রথমশ্রেণীর গল্পে রূপান্তরিত হতে পারে এ সত্য আশা করি গল্পকার শীঘ্র অনুধাবন করতে পারবেন।

সমীর কান্তির 'ভয়' গল্পের মানসিকতা মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং বিশ্লেষণ যথাযথ হলেও গল্পরস জমে ওঠেনি। ভয় গল্পে ভয়ের অনুভূতি বা ইমেজ গড়ে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ছোট গল্পের আমেজ মাত্রাতিরিক্ত মনোবিশ্লেষণের চাপে জমে উঠতে পারেনি।

'অন্যরকম কথামালায়' সমীরকান্তি বিশ্বাস একটি বিশ্বাসযোগ্য অ্যাবসার্ড বিষয়বস্তু সংযোজন করে একটি গভীর জীবনবোধের বিশৃঙ্খ বাস্তব কাহিনী প্রতীকের মাধ্যমে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। লেখকের অনুভূতির আন্তরিকতা ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য গল্পটির দিকে খুব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যাপ্লাবিত এলাকায় চাষবাস

বরুণ মাইতি



নদী নালার দেশ পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলায় প্রতি বছর বন্যা প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। ফলে বেশ কিছু এলাকার ফসল বিশেষ করে আমন ধান নষ্ট হয়ে যায় বা চারার অভাবে এবং জমি চাষবাসের অনুকূল অবস্থায় না থাকায় শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞ-গণ কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। এর ফলে বন্যা প্লাবিত এলাকায় শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বন্যা দেখা যায় সাধারণত আষাঢ় থেকে আশ্বিন বা জুন মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে।

(ক) যদি জুন বা জুলাই মাসে বন্যা আসে এবং জুলাই মাসের শেষাশেষি জল মাঠ থেকে নেমে যায় তবে পুনরায় চারা রোয়া যেতে পারে। বীজতলা চলতি নিয়মে অথবা অবস্থা বিশেষে ডেপগ পদ্ধতিতে করা যাবে। তবে আই-আর-২০, পুসা ২-২১, এন. সি ১২৮১, পলমন, সি এন এম ২৫, ওসি ১৩৯৩ জাতের ধানই বীজ হিসাবে নেওয়া ভালো।

(খ) আগষ্ট মাসে যদি বন্যা হয় বা জুন-জুলাইয়ের বন্যার জল ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আগষ্ট মাসে শেষাশেষি জল নেমে যায় তবে বীজতলা অন্যস্থানে আগেই করে নিয়ে চারা রোয়া করতে হবে। এই সময়ে আই আর-২০, এন সি ১২৮১, ওসি ১৩৯৩ জাতের ধান বীজ হিসাবে উপযুক্ত।

অথবা যে জমির ধান বন্যায় নষ্ট হয়নি সে জমি থেকে ধানগাছের সবল পাশকাঠি (যদি বেশি থাকে) তুলে রোয়া যেতে পারে। এই নিয়মে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পযন্ত রোয়া সম্ভব।

(গ) যদি সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা আসে তবে জগন্নাথ, সি আ'র ১০১৪, এন সি ১২৮১, ও সি ১৩৯৩ জাতের ধানের বেশি দিনের চারা (৬০-৮০ দিনের) রোয়া করে মোটামুটি ফলন পাওয়া যায়। অবস্থা অনুকূল না থাকলে কলাই সরষে, প্রভৃতি শস্য চাষের প্রতি নজর দেওয়া ভালো।

(ঘ) অক্টোবর মাসের বন্যায় ধানের ক্ষতি হলে রবি শস্য চাষে নজর দিতে হবে। সেচ সুবিধা থাকলে গম, আলু, প্রভৃতি শস্যচাষ এবং সেচহীন এলাকা হলে ছোলা, মসুর, তৈলবীজ জাতীয় শস্যের চাষ করা যেতে পারে।

বন্যায় জমি জায়গা সব ডুবে যায় বলে বীজতলা করার ভীষণ অসুবিধা দেখা যায়। আবার অল্প সময়ের মধ্যে চারা করতে না পারলেও চাষের অসুবিধা। অল্প সময়ে এবং অল্প জায়গায় বেশি জমির জন্য চারা করতে হলে ডেপগ পদ্ধতিতে বীজতলা করা খুবই যুক্তিযুক্ত। জায়গা উঁচুনীচু থাকলে সমতল করে পরিচর্য্যার সুবিধার জন্য ৪ ফুট চওড়া এবং সুবিধামত লম্বা করে বীজতলা করা যেতে পারে। বীজতলার চারদিকে দু' ইঞ্চির মত উঁচু এবং দু ইঞ্চি পুরু কাদার আইল দিয়ে ঘিরে রাখা প্রয়োজন।

এরপর পলিথিন চাদর বা কলাপাতা এমনভাবে বিছিয়ে দিতে হবে যাতে সেচের জল ঐ স্তর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে না পারে ও চারা গাছের শেকড় মাটি স্পর্শ করতে না পারে। এবার এই স্তরে শোধন করা ও জল বের হওয়া বীজধান সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ৪ ফুট চওড়া এবং ১১ ফুট লম্বা এমন একটি বীজতলায় ৬ কেজি বীজ বোনা যায় এবং তা থেকে তৈরী চারায় এক বিঘে জমি রোয়া যাবে। এক কাঠা ডেপগ বীজতলার চারায় ১৬ বিঘে জমি রোয়া যায়।

বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর যাতে সরে না যায় অথচ সব-সময় ভিজে থাকে সেজন্য সকালে ও সন্ধ্যায় জল ঝারি (ওয়াটারিং ক্যান) দিয়ে সেচ করতে হবে, অল্প বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি বেশি হলে এবং বীজ-তলায় জল জমে গেলে সেই জল ধীরে ধীরে বের করে দিতে হবে। প্রখর রৌদ্র এবং বৃষ্টির সময় বীজতলা পলিথিনের চাদর বা কলা পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ভালো। চারার শেকড় শক্ত স্তর ভেদ করে নীচের দিকে যেতে পারবে না, ফলে প্রথম অবস্থায় চারাকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দিতে থাকবে। তাই প্রথম ৪।৫ দিন সকালে ও বিকালে হাত বা কাঠের হাতা দিয়ে চারাগুলিকে চেপে দিতে হবে। কয়েকদিন পর চারা একটু বড় হলে বীজতলাতে আধ ইঞ্চি পরিমাণ জল জমিয়ে রাখতে হবে।

সাধারণত ১০।১৫ দিনে চারা রোয়ার উপযুক্ত হয়। তখন ৩।৪ টি পাতাই জন্মায়। এই সময় প্রয়োজন বোধে কাজের সুবিধার জন্য বীজতলা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে মাদুরের মত জড়িয়ে মাঠে রোয়ার জন্য নেওয়া যায়। চারা বেশি বড় করা হয় না বলে জমিতে ছিপছিপে জল রেখে রোয়া দরকার। রোয়ার জমিতে জল বেশি থাকলে চারা বড় করার জন্য প্রথমে কোন উঁচু জমিতে ঘন করে লাগিয়ে চারা বড় হলে কিছুদিন পর তুলে আসল রোয়ার জমিতে রোয়া যাবে।

রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী

২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কংগ্রেসের সভাপতি হবার আহ্বান এল অমনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলেন তিনি (১৯৬২)। জননায়ক লালবাহাদুর জানতেন রেড্ডি কী ধাতুতে গড়া। তাই তাঁর মন্ত্রীসভায় রেড্ডীর ডাক পড়ল (১৯৬৪)। তারপর কখনো তাঁর মাতৃভূমি অন্ধ্রে—কখনো দিল্লীতে যখন যেখানে যে কাজে প্রয়োজন হয়েছে সদাপ্রস্তুত সৈনিকের মতই রেড্ডী সেখানে ছুটে গিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে হলেন সংসদের স্পীকার। কিন্তু ১৯শে জুলাই ১৯৬৯ সালে ভি. ভি. গিরির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন—দিল্লীর জটিল রাজনীতির আবর্তে পদমর্যাদা নিয়ে যত লড়াই রয়েছে ততটা দেশ সেবার মনোভাব নেই। তাই ঘৃণায় রাজনীতি ছেড়ে কৃষকের সন্তান ফিরে গেলেন ইল্লুরুতে মাটির টানে। মত্ত হয়ে রইলেন কৃষি নিয়ে।

এল ১৯৭৭। দেশজুড়ে বিক্ষোভ, অসন্তোষ আর সন্ত্রাসের বিভীষিকার সঙ্গে মোকাবিলায় ফিরে এলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। লোকসভার সদস্য থেকে স্পীকার, স্পীকার থেকে দেশের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন জনগণ বন্দিত মহানায়ক—নীলম সঞ্জীব রেড্ডি।

রাজনীতিতে তাঁর ফিরে আসার কারণটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে—বিভীষিকা আর ত্রাসের আতঙ্ক দূর করে গণতন্ত্রের ওপর দেশবাসীর বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসবো —

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, জনগণের ওপরে শ্রদ্ধাশীল জননেতা রেড্ডির যোগ্য উক্তি সন্দেহ নেই। বিশ্বাস রাখি তাঁর সুযোগ্য ও বহুদর্শী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে।

খাদ্যের অপ্রচলিত উৎস সন্ধানে

৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হয়। এতে দুধের মতো তরল জাতীয় এক অবদ্রব (Emulsion) বেরিয়ে আসে। দ্রবণের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ প্রভৃতি থাকে সার হিসাবে। এর সঙ্গে নানা রকমের খনিজ লবণ এবং খাদ্যপ্রাণ মিশ্রিত হয় প্রয়োজন অনুসারে। বিক্রিয়া কক্ষে ঈষ্টের দ্রবন মিশিয়ে দিয়ে উপযুক্ত তাপ এবং দ্রবণের অম্লত্বের নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিশেষভাবে। এরপর মিশ্রণের মধ্যে নির্মল বায়ু পরিচালিত হতে থাকে। সন্ধান কাজ (Fermentation) চলে, ঈষ্ট কোষগুলো সংখ্যায় বেড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি। বিক্রিয়া শেষে এক কোষী সজীব বস্তুগুলোকে (Uni Cellular Organisms) বিশেষ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। এই এককোষী পদার্থগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে শুকনো করলে পাওয়া যায় ঘিয়ে রংয়ের এক রকম গুঁড়ো। এই গুঁড়ো পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'টপ্রিণা' (Toprina)। এর মধ্যে প্রোটিনের ভাগ হলো শতকরা ৬৫ ভাগ, জিভে দিলে এর স্বাদ পাওয়া যায় না বল্লেই চলে।

কার্বন সমন্বিত উদ্ভিজ পদার্থ (সেলুলোজ কার্বোহাইড্রেট) এবং খনিজ তেল—এদের প্রত্যেকটি থেকেই এককোষী প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতির একটা বিশেষ সুবিধে আছে। যেখানে এক কিলোগ্রাম পরিমাণ খনিজ তেল থেকে এক কিলোগ্রাম ঈষ্ট-কোষ উৎপন্ন হয়, সেখানে শর্করা জাতীয় পদার্থ থেকে অর্দ্ধেক পরিমাণ এক কোষী প্রোটিন পাওয়া যায়। আবার শেষের প্রক্রিয়াতে খনিজ তেল প্যারাফিন মুক্ত হয় এবং তার ফলে নানান এঞ্জিনের উপযোগী ডিজেল তেল উপজাত দ্রব্য হিসাবে বেরিয়ে আসে। তা দিয়ে জল গরম করা চলে, আবার জল সেচের এঞ্জিনের কাজেও লাগে।

আলো, হাওয়া, বৃষ্টিপাত, মাটি প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে কোন এক আবদ্ধ পাত্রে এই ধরনের আমিষ খাবার বাড়িয়ে তোলা যাবে, অতি দ্রুত তালে বংশ বৃদ্ধির জন্য সময়ও বাঁচবে। দেখা গেছে যে, এই রকম এক কোষী সজীব বস্তু দু'ঘন্টায় বেড়ে গিয়ে হয় দ্বিগুণ। এই বৃদ্ধির তুলনায় তৃণভোজী গবাদি পশুর বৃদ্ধির হার এক লক্ষ ভাগ মতো কম। গৃহ পালিত গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে নিরাপদ বলে এই সব এককোষী প্রোটিন পরীক্ষার পর্যায় পেরিয়েছে। অবশ্য মানুষের উপযোগী খাদ্য কিনা তার নিশ্চিত উত্তর পাবার জন্য এখনও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে।

ফ্রান্স, ক্যানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোতে খনিজ তেল থেকে এক কোষী আমিষ খাদ্য তৈরী করবার জন্য বড় বড় প্রকল্পে উৎপাদন চলেছে। আমাদের দেশেও এই রকম আমিষ খাবার তৈরী করবার জন্য দেরাদুনের Indian Institute of Petroleum এক পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ করেছেন, দিনে এর উৎপাদন ক্ষমতা হলো পঞ্চাশ কিলোগ্রাম প্রোটিন। পরীক্ষামূলক কার্যসূচীর সাফল্যের পর এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি গুজরাট শোধনাগারে স্থানান্তরিত করে উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াস চলেছে।

রাজ্যসভার ডাকটিকিট

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গঠিত হয় এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে রাজ্যসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ই মে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর রাজ্যসভার গৌরবময় ২৫ বছর পূর্ণ হলো। রাজ্যসভার শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিলো ২১৬ জন; বর্তমানে ২৪৪ জন। রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয় পরোক্ষভাবে, কিছু সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। প্রতি দু'বছর অন্তর রাজ্যসভার মাত্র এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং রাজ্যসভা কখনোই লোকসভার মতো একেবারে ভেঙ্গে যায় না। এবং লোকসভা ভেঙ্গে যাওয়া কালীন রাজ্যসভাই সংসদের দায়িত্ব বহন করে, জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে। গত ২৫ বছরে রাজ্যসভা তার কর্তব্য পূর্ণভাবেই পালন করেছে। ভারতের ডাকবিভাগ রাজ্যসভার ২৫ বছর পূর্তিকে স্মরণে রেখে, রাজ্যসভার ১০১ তম অধিবেশন চলাকালীন গত ২১শে জুন একটি বহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। নকশায় দেখা যাচ্ছে সংসদ ভবনের রাজ্যসভা-কক্ষটির একাংশ।

ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের সহযোগী ডাকটিকিটগুলি ভবিষ্যতে মূল্যবান দলিল বলেই গৃহীত হবে।



শিশুর পরিচর্য্যা

উমা সরকার

নবজাত শিশুর যত্ন পরিচর্য্যার ব্যাপারে মা বাবা উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। যাঁরা নতুন মা হয়েছেন তাঁরা সন্তান পালন বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন। নতুন পিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। অথচ ডাক্তারী ফরমুলার চাইতেও পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা, উদ্বেগ ইত্যাদি সহজাত প্রবণতাই শিশুর যত্নপরিচর্য্যার শ্রেষ্ঠ সহায়।

দরকারী কয়েকটি জিনিস

বাচ্চার জন্মের পরই কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রথমেই দরকার বিছানা। সম্ভব হলে বাচ্চার জন্য একটি ছোট খাট (বেবীকট), এক সেট ছোট তোষক, বালিশ, লেপ ইত্যাদি। তোষক ও বালিশ খুব নরম হবে কিন্তু বেশী পুরু না হওয়াই ভাল। একটি অয়েলক্লথ, ফ্লানেল কাপড়ের আধমিটার সাইজের এক ডজন কাপড়ের টুকরা। এগুলো বাচ্চার অয়েলক্লথের উপর বিছানো হবে। নবজাত শিশুকে প্রথমেই সেলাই করা শক্ত কাঁথা না দেওয়াই ভাল। একমাস বয়স হলে কাঁথা ব্যবহার চলবে। আর ছোট একটি মশারী, স্নানের বাথ টব, দুধের বোতল, কয়েকটি নিপল, একটি নতুন অ্যালুমিনিয়াম বা ষ্টিলের পাত্র যাতে বাচ্চার খাওয়ার বা দুধের জল গরম করা হবে। একটি নতুন বাটি ও চামচ। স্নানের জন্য নরম তোয়ালে একটি, এক ডজন জামা কাপড়। বাচ্চাদের সাবান একটি, বেবী পাউডার একটি এবং গায়ে মাখার জন্য ভিটামিনযুক্ত অলিভঅয়েল।

বাচ্চার খাদ্য

জন্মের পর বাচ্চার প্রধান খাবার হচ্ছে দুধ। নবজাত শিশুর পক্ষে মায়ের দুধই শ্রেষ্ঠ। কারণ মায়ের দুধে প্রয়োজনীয় সবরকম ভিটামিন থাকে। মায়ের দুধে বাচ্চার পেটের কোন গোলমাল বা ইন্‌ফেকশন হওয়ার ভয় থাকে না। দুধ চুষে খাওয়ার যে জন্মগত ইচ্ছা বাচ্চাদের থাকে তার পরিতৃপ্তি ঘটে। মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দুধ খেতে পায় বলে মানসিক দিক দিয়েও বাচ্চা তৃপ্ত থাকে। মায়ের শরীরের পক্ষেও ভাল বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো।

মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পরিমাণের কোন হিসাবের দরকার নেই। বাচ্চার যতটা দুধ প্রয়োজন ততটাই সে পান করে ঘুমিয়ে পড়বে। সাধারণত ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট বাচ্চা দুধ পান করে। কোন কোন বাচ্চা ৩০ মিনিট সময়ও নেয়। বাচ্চার ওজন যদি ঠিকমত বাড়ে তাহলে অন্য দুধের আর দরকার নেই। কিন্তু মায়ের দুধে যদি বাচ্চার কম পড়ে তাহলেই তাকে তোলা দুধ দিতে হবে।

বোতলে খাওয়া

বাচ্চাকে সাধারণত জন্মের ১২ ঘন্টা পরেই বোতল দেওয়া যেতে পারে। বোতলে করে বাচ্চাকে গরুর দুধ বা বেবীফুড খাওয়ানো হয়। গরুর দুধের সঙ্গে প্রথমে সমপরিমাণ বা আরও বেশী জল মিশিয়ে নিতে হবে। এর সঙ্গে চিনি মেশাতে হবে। কিন্তু বেবীফুড খাওয়ালে চিনি মেশানোর দরকার নেই। এক চামচ দুধের সঙ্গে ১ আউন্স জল হিসাবে দুধটা গুলে নিয়ে খাওয়াতে হবে। প্রথমে বাচ্চাকে আধ আউন্স দুধ দিয়ে খাওয়ানো আরম্ভ করে আস্তে আস্তে দুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে। নইলে বাচ্চা হজম করতে পারবে না। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় ঈষৎ গরম অবস্থাতে দুধটা খাওয়াতে হবে। বাচ্চা নিজেই নিজের দুধের পরিমাণ ঠিক করে নেবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চার ওজন ঠিকমত বাড়ছে কিনা। অনেক বাচ্চা খেতে খেতে কাঁদে তখন বাচ্চার খাওয়ানো বন্ধ করে বাচ্চার পেট থেকে হাওয়া বের করে দিতে হবে। বাচ্চাকে কাঁধের উপরে রেখে পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারলে বাচ্চার মুখ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে তখন আবার দুধ দিলে বাচ্চা খেতে শুরু করবে। দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চার পেটে হাওয়া ঢুকে বাচ্চার পেট ভর্ত্তি করে ফেলে। এই কারণে অনেক সময় বাচ্চা আর খেতে চায় না। খাওয়া শেষ হলে পুনরায় বাচ্চার পেট থেকে অনুরূপ ভাবে হাওয়া বের করে দেওয়া প্রয়োজন। এতে বাচ্চার অস্বস্তি দূর হবে এবং হজম ভাল হবে। বোতলের দুধ বাচ্চাকে মোটামুটি নিয়ম মেনে দেওয়াই উচিত।

ডাক্তারের মতে খাওয়ানোর সময় সকাল ৬টা, ৯টা, দুপুর ১২ টা, ৩টা, সন্ধ্যা ৬ টা, রাত ১০টা এবং রাত ২ টা। খুব ছোট বাচ্চা ও কম ওজনের বাচ্চাদের হয়ত আরও তাড়াতাড়ি খাওয়াতে হতে পারে। প্রয়োজনে সময় এদিক ওদিক করে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চা কাঁদলে প্রথমে দেখতে হবে সে ক্ষিদেয় কাঁদছে কিনা, খেতে না

চাইলে বুঝতে হবে পেটের ব্যাথা বা অন্য কোন কারণে বাচ্চা কাঁদছে। বাচ্চার পেট না ভরলে সে বোতল ছাড়তে চাইবে না, তখন বুঝতে হবে বাচ্চার দুধ আরও বাড়ানো দরকার। বাচ্চা নিজের ইচ্ছেমত খাওয়ার পর অবশিষ্ট দুধটুকু খাওয়ানোর জন্য বেশী জোর না করাই ভাল। বাচ্চা একটু বড় হলে ৪ ঘণ্টা পরে পরে দুধ দিলেও চলবে। রাত ১১ টার পরে আর বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার দরকার হবে না। রাত দুটোর দুধ আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রত্যেক বার দুধ খাওয়ানোর পর বাচ্চার দুধের বোতল খুব ভালভাবে ব্রাস করে ধুয়ে ফেলতে হবে। দিনে একবার সাবান জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলা উচিত। প্রত্যেক বার ধোয়ার শেষে গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। বাচ্চার চামচ, বাটি, নিপল ইত্যাদিও এই সঙ্গে ভালভাবে গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। কোনরকম জীবাণু যাতে বোতল বা নিপলে জন্মাতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভিটামিন

ছোট বাচ্চার অতিরিক্ত ভিটামিন 'ডি' এবং ভিটামিন 'সি' অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ গরুর দুধ বা অন্যান্য খাবার যা বাচ্চাকে দেওয়া হয় তাতে এই ভিটামিনগুলো পরিমাণে খুব বেশী থাকে না। আবার মায়ের দুধে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকলেও ভিটামিম 'ডি' থাকে না। ভিটামিন 'এ' খুবই প্রয়োজন বাচ্চাদের। তাই ডাক্তারের পরামর্শমত ভিটামিন ড্রপ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। মালটিভিটামিনের কোন দরকার নেই।

ফলের রস

বাচ্চা কয়েক মাসের হলে বাচ্চাকে কমলা লেবুর রস বা মুসাম্বির রস দেওয়া যায়। প্রথমে ১ চামচ কমলালেবুর রসের সঙ্গে একচামচ ফোটানো ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। পরে দিনে দু চামচ রস ও দু চামচ জল, তৃতীয় দিনে তিন চামচ রস ও সম পরিমাণ জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এমনি করে ১ আউন্স পর্য্যন্ত বাড়িয়ে ক্রমে জল কমিয়ে কমিয়ে শুধু রসটাই দিতে হবে। দুই আউন্স থেকে চার আউন্স পর্য্যন্ত রস বাচ্চাকে দেওয়া যেতে পারে। পাঁচ, ছ' মাস পর্য্যন্ত বাচ্চা বোতলেই রসটা খাবে পরে কাপে খাওয়াতে অভ্যাস করতে হবে। পরবর্ত্তী দুধ বা খাবার খাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে রসটা দিতে হবে। সাধারণত বাচ্চার স্নানের আগেই রসটা দেওয়া ভাল।

খাবার জল

অনেকে বাচ্চাকে দু'বেলা সাদা জল খাওয়াতে বলেন। বাচ্চাদের এক বছর বয়স পর্য্যন্ত আলাদা জলের দরকার হয় না। প্রয়োজন হলে বাচ্চাকে ফোটানো পরিষ্কার ঈষৎ উষ্ণ জল

বা মিছরির জল খাওয়াতে পারেন। বিশেষ করে বাচ্চা অসুস্থ হলে বা রাত্রের দুধ ছাড়াতে চাইলে দুধের বদলে প্রথমে জল খাওয়াতে হবে। খুব গরম পড়লেও বাচ্চাকে জল খাওয়াতে পারেন।

শক্ত খাবার

বাচ্চার যখন ৩ মাস বয়স হবে তখন বাচ্চাকে শক্ত খাবার দিতে হবে। শক্ত খাবার বলতে প্রথমে বাচ্চাকে কোন Cereal দিতে হবে যেমন ফ্যারেক্স বাল আমুল ইত্যাদি। প্রথমে ১ চামচ Cereal এর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে বেশ পাতলা নরম করে বাচ্চাকে চামচে করে মুখে দিতে হবে। বাচ্চা খেতে পছন্দ করলে এবং সহ্য করতে শিখলে আস্তে আস্তে ১ চামচ করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ২/৩টা পারে খেতে দিন।

ফল

ফলটা সাধারণত দ্বিতীয় শক্ত আহার হিসাবে গণ্য করা হয়। Cereal খাবার আরম্ভ করার পর ফল দিতে হবে। ৬ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত বাচ্চাদের সেদ্ধ করে ফলটা দিতে হবে। অবশ্য পাকা কলা বাদে। পাকা কলা ভাল করে চটকে প্রথমে অল্প পরিমাণে, ক্রমশ পরিমাণ বাড়িয়ে গোটা একটা কলা খাওয়ানো চলবে। বাচ্চাকে দু'বার করে ফল দেওয়া যেতে পারে যদি সে খেয়ে হজম করতে পারে। এক বছর বয়স হলে সিদ্ধ না করেই পাতলা করে কাটা ফল দেওয়া যেতে পারে।

সব্জি

সিদ্ধ সব্জি Cereal এর সঙ্গেই বাচ্চাকে দিতে হবে। তাছাড়া তাজা সব্জি সেদ্ধ করে সামান্য নুন মিশিয়ে বাচ্চাকে আলাদা করে খাওয়ানো যেতে পারে। সব্জির মধ্যে আলু, গাজর, বীট, টমেটো, বিন, কাঁচকলা মটরশুঁটি ইত্যাদি দেওয়া ভাল।

ডিম

ছ'মাসের পর থেকে ডিম দেওয়া ভাল। প্রথমে ডিমের কুসুমটা দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে। কারণ এতে এলার্জির ভয় থাকেনা। ডিমের সাদা অংশেই এলার্জি হয়। ক্রমে পুরো ডিমটাই দিতে হবে।

মাছ-মাংস

ছ'মাসের পর থেকে বাচ্চাকে মাছ মাংস দেওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে সুপ তৈরী করে দিতে হবে। ক্রমে সুসিদ্ধ মাছ বা মাংস খেতে শিখবে।

এক বছরের বাচ্চার মোটামুটি এইরূপ খাবারের চার্ট হবে। সকালে—Cereal, ডিম, টোষ্ট ও দুধ। দুপুরের খাবার—ভাত বা রুটি, সবজি, আলু, মাছ বা মাংস, ফল ও দুধ। রাত্রের খাবার হবে—Cereal, দুধ ও ফল। Cereal-এর বদলে রুটি বা মাখন টোষ্টও দেওয়া যেতে পারে। কলা ছাড়া অন্য ফলের সঙ্গে সামান্য চিনি মেশাতে হবে। পরে আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে চিনি মেশানো বন্ধ করে দিতে হবে। ২ বছর থেকে বাচ্চা সাধারণ সব রকম খাবার পরিমাণ মত খাবে।

প্রতিদিনের পরিচর্য্যা

প্রতিদিনের পরিচর্য্যার মধ্যে স্নান একটি বড় কাজ। প্রতিদিন বাচ্চাকে ১০ টার সময় ভাল করে তেল মাখিয়ে সামান্য গরম জলে নির্দিষ্ট টবে স্নান করাতে হবে। স্নান করানোর আগে হাতের কাছে বাচ্চার সাবান, স্নানের তোয়ালে, গা মোছানোর তোয়ালে, জামা ইত্যাদি রাখুন। গা মাথা মুছিয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিন। পরে গায়ে সামান্য পাউডার ছড়িয়ে জামা পরিয়ে দিন। বেশী ঠাণ্ডা পড়লে বা শীত বেশী হলে, বৃষ্টির দিনে, বাচ্চাকে স্নান না করিয়ে গরম জলে গা মুছিয়ে দিন। একেবারে ছোট বাচ্চাকে স্নানের সময় বা-হাতের উপর মাথাটি রেখে বাচ্চার শরীর জলে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে নরম কাপড়ে বাচ্চার গা ধুয়ে দিয়ে মাথায় জল দিন। সাবান কখনই যেন চোখে না দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চা খুব চিৎকার করবে। কান, চোখ, নাক, মুখ এবং নখেরও প্রতিদিন পরিচর্য্যা করা দরকার। বাচ্চার কান, চোখ, নাক, মুখ যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বাচ্চার নখ নিয়মিত কেটে ফেলতে হবে। বাচ্চা ঘুমুলে বাচ্চার নখ কাটার প্রশস্ত সময়।

বাচ্চার পোষাক

বাচ্চার পোষাক ঢিলেঢালা হওয়া দরকার। এগুলো সুতীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাচ্চার জামা পুরো পিঠের দিকে কাটা হলে ভাল হয়। গরম সোয়েটার পরানোর সময় হাত আগে ঢুকিয়ে পরে মাথা ঢুকিয়ে পরাতে হবে। বাচ্চাকে জাঙ্গিয়া না পরিয়ে প্রথম মাস ছোট কাপড়ের টুকরো কোমরে জড়িয়ে রাখা ভাল এতে বাচ্চার গায়ে আঘাত লাগবে না।

বাচ্চার জামা কাপড়, কাঁথা ইত্যাদি প্রতিদিন সাবান জলে কেঁচে ভালভাবে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। খোলা রৌদ্রে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। রৌদ্রে শুকালে কাপড় চোপড় জীবাণু মুক্ত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাচ্চার কাঁথা, কাপড় ডেটল জলে চুবিয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া দরকার।

বাচ্চা যেন কখনই প্রস্রাবে ভিজে কাপড়ে না থাকে। এতে বাচ্চা অস্বস্তি বোধ করে এবং গায়ে ফুস্কুড়ি বেরিয়ে ঘা হতে পারে।

ঘুম

বাচ্চাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বাচ্চা যে ঘরে ঘুমাবে সে ঘরটি খোলামেলা আলোবাতাস যুক্ত হওয়া একান্ত দরকার। বাচ্চার ঘরে যেন বেশী শব্দ বা চীৎকার গণ্ডগোল না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাচ্চারা সাধারণত ছোট বেলায় খাওয়ার সময় ছাড়া সর্বক্ষণ ঘুমায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও কমতে থাকে।

বেড়ানো

ছ'মাসের সময় থেকে বাচ্চাদের সকাল বিকালে বাইরে খোলা মাঠে বা পার্কে একঘণ্টা করে বেড়িয়ে আনলে বাচ্চা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই সুস্থ থাকবে।

নূতন বাজেটঃ বাংলা ছবির সংকট

অমলেন্দু শূর

১৯৭৭-এর অর্থনৈতিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন—তাতে চলচ্চিত্রের ওপর নতুনভাবে লেভি ধার্য করা হয়েছে। বিষয়টি কার্যকর হলে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে—একথা নির্দ্বিধায় বলছেন এই শিল্পে নিয়োজিত প্রত্যেকটি মানুষ। এই লেভির ফলে শুধু বাংলা ছবিই নয়, সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ছবি এক মহা-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এবং সেই মহা-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবীকালের মহা-দুর্দিনের দুঃস্বপ্ন দেখছেন আঞ্চলিক ছবির প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালক, কলাকুশলী-শিল্পী, স্টুডিও মালিক এবং কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যদি লেভি-বিষয়কে কোনো সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন—তাহলে আঞ্চলিক ছবি, সাবিকভাবে এই শিল্পের মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে অবশ্যই।

প্রস্তাবিত নতুন বাজেটে বলা হয়েছে, ছবি নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচের ওপর ১০% হিসাবে লেভি দিতে হবে। বস্তুত, এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তদুপরি পৃথিবীর কোনো দেশেই চলচ্চিত্রের ওপর এরূপ অতিরিক্ত লেভি ধার্যের কথা শোনা যায়নি। এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে এরূপ অস্বাভাবিক-অসম্ভব চিন্তা করেন কিনা সন্দেহ।

আঞ্চলিক ছবি একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা-কেন্দ্রিক। সেকারণে এই ছবির বাজার খুবই সীমিত। যেমন, বাংলা ছবির বড় বাজার একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়া একটি সাধারণ ছবি পিছু গড়ে পরিচালক-প্রযোজক শেয়ারে (ক) আসাম থেকে পাওয়া যায় ৩০।৩৫ হাজার টাকা। (খ) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, দিল্লি, কানপুর, বেনারস প্রভৃতি শহর এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে পাওয়া যায় ১০।১৫ হাজার টাকা। (গ) ভারতের বাইরে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত হয় ১০/১২ হাজার টাকা। সুতরাং একমাত্র বাজার কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি।

সুতরাং একটি সাধারণ বাংলা ছবি অসাধারণ বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করলে প্রযোজক ও পরিবেশক এই নির্দিষ্ট বাজার থেকে যা সংগ্রহ করেন তার গড় পরিমাণ:

(ক)	কলকাতা	১,৫০,০০০ টাকা
(খ)	বিভিন্ন জেলা	৩,০০,০০০ টাকা
(গ)	আসাম	৩৫,০০০ টাকা
(ঘ)	ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল	১৫,০০০ টাকা
(ঙ)	ভারতের বাইরে	১২,০০০ টাকা
	মোট	৫,১২,০০০ টাকা

বর্তমানে খুব সাদামাটা এবং সাদা-কালোয় নির্মিত একটি বাংলা ছবিতে মোট ব্যয় হয় গড়ে ৫,০০,০০০ টাকা। রঙিন হলে ন্যূনপক্ষে ১০,০০,০০০ টাকা। এছাড়া যাঁরা ছবিতে কিছু উপভোগ্য করে পরিবেশন করতে চান, অর্থাৎ কোনোরকম কম্প্রোমাইজ না করলে ছবির ব্যয় হয় ৮।৯,০০,০০০ টাকা। সুতরাং প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী ১০% হিসাবে লেভি দিতে গেলে বিভিন্ন বাজেটের ছবির মাথা পিছু ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এইরূপ:

(টাকার হিসেবে)

বাজেট	নতুন লেভি ১০% হারে	মোট খরচ
৫,০০০০০	৫০,০০০	৫,৫০,০০০
৮,০০০০০	৮০,০০০	৮,৮০,০০০
৯,০০০০০	৯০,০০০	৯,৯০,০০০
১০,০০০০০	১,০০০০০	১১,০০০০০

এছাড়া আছে প্রিণ্ট প্রতি ধার্য লেভি যা বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই লেভি বাবদ বর্তমানে যা সরকারকে দিতে হয় তা হলো:

প্রিণ্ট	৪,০০০ মিঃ কম দৈর্ঘের ছবি	৪,০০০ মিঃ বেশি
১—১২টি	×	×
১৩—১৫টি	১৫ পঃ প্রঃ মিঃ	২৫ পঃ প্রঃ মিঃ
১৬—২৫টি	৩৫ ,, ,,	৬০ ,, ,,

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১২ টির বেশি প্রিণ্ট করলে অতিরিক্ত ৩৪,০০০ টাকা আরো দিতে হবে। অর্থাৎ ১৫ টি প্রিণ্টের হিসাব ধরে পুরোনো লেভি দিতে হতো, ৫,০০,০০০ টাকার ছবিতে:

১৫ টি প্রিণ্ট = পুরোনো লেভির হার = ১,২০০ টাকা।

নতুন লেভির ফলে দিতে হবে, ১৫ টি প্রিণ্ট = নতুন লেভির হার = ৫০,০০০ + ১,২০০ টাকা = ৫১,২০০ টাকা।

বাস্তবিক, এ এক অসহনীয় অবস্থা। কেননা, বাংলা ছবির প্রযোজক-পরিবেশকরা কেউই বড়ো ব্যবসায়ী নন। তদুপরি ছবি বাণিজ্যিক সফল হলেও ছবি প্রতি যে ব্যবসা হয়—তার একটা পরিসংখ্যান আগেই দিয়েছি। বহু ক্ষেত্রেই বাংলা ছবির প্রযোজকরা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে ছবির নির্মাণ কার্য সুরু করেন। তারপর ছবি নির্মিত হয় সুদে কর্জ করা টাকার ওপর নির্ভর করে। প্রায় ৯০% ছবির ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছবির সুটিং কোনোক্রমে শেষ হয়, তারপর প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপনের টাকা যোগাড়ের জন্যে প্রযোজক পরিবেশক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। অতপর উপায়ান্তর না দেখে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ করে এনে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত লেভি ছবি মুক্তির পূর্বেই, ছবির অদৃষ্ট কী হবে না জেনেই সম্পূর্ণ খরচের ওপর দিতে

অথচ প্রযোজক ছবি বিক্রির প্রতি ১০০ টাকায় যে শেয়ার পান, তা অতি নগণ্য। একটা পরিসংখ্যান দেওয়া গেলো :

	টা: প:
প্রমোদ কর	৫০.০০
প্রদর্শক শেয়ার	২৫.০০
পরিবেশক শেয়ার	৫.০০
প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপন	৫.৫২
সুদ (মোট খরচের ৫% হারে)	১.৩০
প্রযোজক শেয়ার	১৩.১৮

৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি ছবির মোট খরচ তুলতে হলে যে ব্যবসা করতে হবে তার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৩৮,০০,০০০ টাকা। বক্স অফিস থেকে এই ৩৮,০০,০০০ টাকা সংগ্রহ করলে প্রযোজক তাঁর ৫,০০,০০০ টাকা ফেরৎ পাবেন। এই ৩৮,০০,০০০ টাকায় প্রযোজক কিভাবে ৫,০০,০০০ টাকা পান :

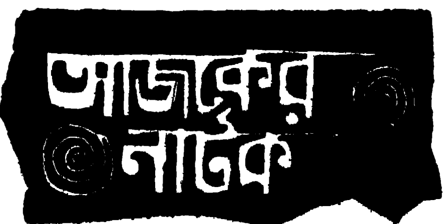
প্রমোদ কর	১৯,০০,০০০ টাকা
প্রদর্শক	৯,৫০,০০০ টাকা
পরিবেশক	১,৯০,০০০ টাকা
প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপন	২,১০,০০০ টাকা
সুদ	৫০,০০০ টাকা
প্রযোজক	৫,০০,০০০ টাকা
মোট	৩৮.০০,০০০ টাকা

পরিশেষে সংযোজন: এর পরেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে ওয়াকেবহাল হবেন কিনা জানা নেই। শুধুমাত্র বলা যায় যে, একটি সাধারণ বাংলা ছবি যার বর্তমানে ব্যয় হবে ৫,০২,০০০ টাকা। সেই টাকা তুলতে ৩৮,০০,০০০ টাকার ওপর ৩,০০,০০০ টাকার ব্যবসার প্রয়োজন। কিন্তু সেই টাকা সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবির বাজার বিস্তার না ঘটলে কিংবা বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলে বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবি, সামগ্রিকভাবে এই শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের হাজার কলাকুশলী-শ্রমিক-শিল্পী বেকার হবেন। বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি বিপন্ন হবে।

চলচ্চিত্রের অ্যাড-ভালোরাম বা লেভি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সংশোধনগুলো: এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করেছে। বলা হয়েছে, আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে ১২টি প্রিণ্ট পর্যন্ত কোনো লেভি দিতে হবে না। ১২টির বেশি প্রিণ্ট করলে নূতন প্রবর্তিত বর্ধিত হারে লেভি দিতে হবে।

বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ছবির প্রযোজক পরিবেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তাঁরা বললেন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই সংশোধন যথেষ্ট নয়। তাঁরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যোগা-যোগ করেছেন। জানা গেলো, অর্থমন্ত্রী বিষয়টি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন। এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় অর্থমন্ত্রী এক বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সরকারীভাবে বিভিন্ন খোঁজ খবর নিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে আরো কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো গৃহীত হতে পারে।

আশা করা যায়, ৬ সপ্তাহ পরে আঞ্চলিক ছবি লেভি-সম্পর্কিত নূতন সংশোধনের মাধ্যমে আরো কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে।



ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে সম্প্রতিকালের সাহিত্য-পাঠকের পরিচয় খুবই যৎসামান্য। আজ একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে কজন বিরল হাস্যরসিক বাংলাভাষায় রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্য-নাথ অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের বাঘা বাঘা সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য ও আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বর্গীয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতির লোভ সামলান গেলো না। "বাংলা গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে বড়ো স্রষ্টা এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মতো কেউই আর কোনদিন আসবেন না। সে সামাজিক অবস্থার পুনরাবর্তন সম্ভব নয়। Ideal এবং Real-এর দ্বন্দ্বে বারে বারে কৌতুক-রঙ্গ-শ্লেষ-রসিকের

লুল্লু

আবির্ভাব ঘটবে, কিন্তু বাঙালীর ফরাস-বিছানো বৈঠকখানায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে এমন গল্পের আসর ভবিষ্যতে আর কেউ জমাতে পারবে না। তাই ত্রৈলোক্য-নাথের মতো গল্পাকারেরও আর জন্ম হবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে কোনো সমালোচকই চিরদিন ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাবেন—তার দ্বারা বাঙালীর রসবোধ এবং ঐতিহ্যনিষ্ঠাই প্রকাশিত হবে।"

বস্তুত, বাঙালীর রসবোধ এবং ঐতিহ্য-নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া গেলো সম্প্রতি 'সময়' নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নেতাজীমঞ্চে 'লুল্লু' নাটকের অভিনয় দেখে। ত্রৈলোক্য-নাথের গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়া বাস্তবিক দুরূহ নিঃসন্দেহে। একথা নির্দ্বিধায় বর্তমান প্রতিবেদক স্বীকার করছেন যে, সাম্প্রতিককালে ত্রৈলোক্যনাথের চরিত্রগুলি পুথীবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মঞ্চে সশরীরে ঘুরে বেড়াবে—এমন কল্পনা নাটক দেখার পূর্বে তার পক্ষে কল্পনা পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে 'সময়' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকার নির্দেশক অমল শূর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। তিনিই সম্ভবত প্রথম. যিনি

ত্রৈলোক্যনাথকে মঞ্চে টেনে নিয়ে এসেছেন।

'সময়' গোষ্ঠী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবেদন রেখেছেন যে, ত্রৈলোক্যনাথের লুল্লু কাহিনীতে নাট্যমূল্য আছে কিংবা আদৌ আছে কিনা তার বিচার করবেন বিদগ্ধ রসিকজন। আমরা আজকে মঞ্চে যা উপস্থাপিত করলাম—তাকে কি বল[illegible] নাটিকা, নাট্যরূপ নাকি সংলাপবিনিময়?—বস্তুত এই প্রতিবেদ[illegible]টি সর্বাংশে সত্য। লুল্লু নাট্যসাহিত্যের বিচারে নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক, কিংবা আলংকারিক নির্দেশনামায় এটি আদৌ [illegible]মে চিহ্নিত হবে কিনা, [illegible] আলোচনায় না গিয়েও অনা[illegible]লা যায় অমল শূর কৃত 'সম[illegible]'র নাটক লুল্লু সংলাপ বিনিময় [illegible]লেও মঞ্চে লুল্লুর প্রযোজনা ও পরিবেশনা [illegible]শ্যই অভিনব।

ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' গল্প-[illegible]টি থেকে লুল্লু গল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। গল্পের মুখ্য চরিত্র আমাদের বি[illegible]মুখী কর্মপ্রয়াস ও পরিশেষে স্ত্রীকে উদ্ধারই গল্পের মুখ্য বিষয়। কিন্তু লেখক এই গল্পটিতে মুখ্য কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অক্লেশে আরো অনেক গল্প এনে ফেলেছেন। তাঁতি ও তার সঙ্গীতপ্রিয়তা, কিংবা ঘ্যাঁঘো ভূত ও নাকেশ্বরীর পেত্নীর সঙ্গে তার প্রণয় ও বিরহ প্রভৃতি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার নির্দেশক এই কাহিনীগুলিকে গ্রথিত করেছেন বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে আধুনিক চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক রীতির প্রয়োগের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নাটকের কোথাও একঘেয়েমি বা ক্লান্তি আসেনি। [illegible] ভূত এবং কিছু মানুষের উদ্ভট কর্মকাণ্ড দেখে দর্শক প্রতিমুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত হেসেছেন, করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে



লুল্লু নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্য

নাট্যক্রিয়ার কাহিনী গ্রন্থনায় মাঝে মাঝে কিছু সঙ্গতি হারিয়েছে—যার ফলে নাটকটির কিছুকিছু অংশ এলোমেলো মনে হতে পারে।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে নূতনত্ব চোখে পড়লো। মঞ্চে একটিমাত্র সেট আমীরের বাড়ী। তারপর সাদা পর্দায় বিভিন্ন স্থানে ছায়া ফেলে অভিনয় রীতিটি বাস্তবিক প্রশংসার্হ। এ ব্যাপারে শিল্প নির্দেশক বাসু ভট্টাচার্যের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। পল্লব ঘোষের আলো আরও অভিনব হলে ভাল হত। মঞ্চে ভূতদের আবির্ভাবকালে আলোর ব্যবহারে আরো সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো।

অভিনয়াংশ উত্তম না হলেও এককথায় ভালো। তবে আরো বেশকিছু অনুশীলন সাপেক্ষ। তবু চোখে পড়ার মতন অভিনয় করেছেন, মিহির চৌধুরী, সরোজ রায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, গৌরা নাগ, পরেশ হাজরা, নৃপেন মাইতি, রমেন শীল, কাশীনাথ কোলে, আশীষ দাস, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পীরা।

সঙ্গীত এবং শব্দকে এত উপেক্ষা করা হলো কেন? এই নাটকের প্রাণ সঙ্গীত এবং শব্দ। জানিনা নির্দেশক হাসির নাটক হিসাবেই এটিকে গ্রহণ করেছেন কিনা। হাসিতো আছেই, কিন্তু রহস্যময়তাও তো আছে। নির্দেশক এব্যাপারে ত্রুটি সংশোধন করবে। আশা করি।

কলাকুশলের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় তা হলো পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা। বিভিন্ন পোষাকের বিশেষত ভূতদের পোষাক পরিকল্পনা অবশ্যই অভিনব। বাস্তবিক মঞ্চে কতকগুলি অবিকল ভূত দেখতে পাওয়া আশ্চর্য বৈকি।

'সময়'-এর লুল্লু সম্প্রতিকালের এক উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা।

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণান
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং [illegible]ভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।